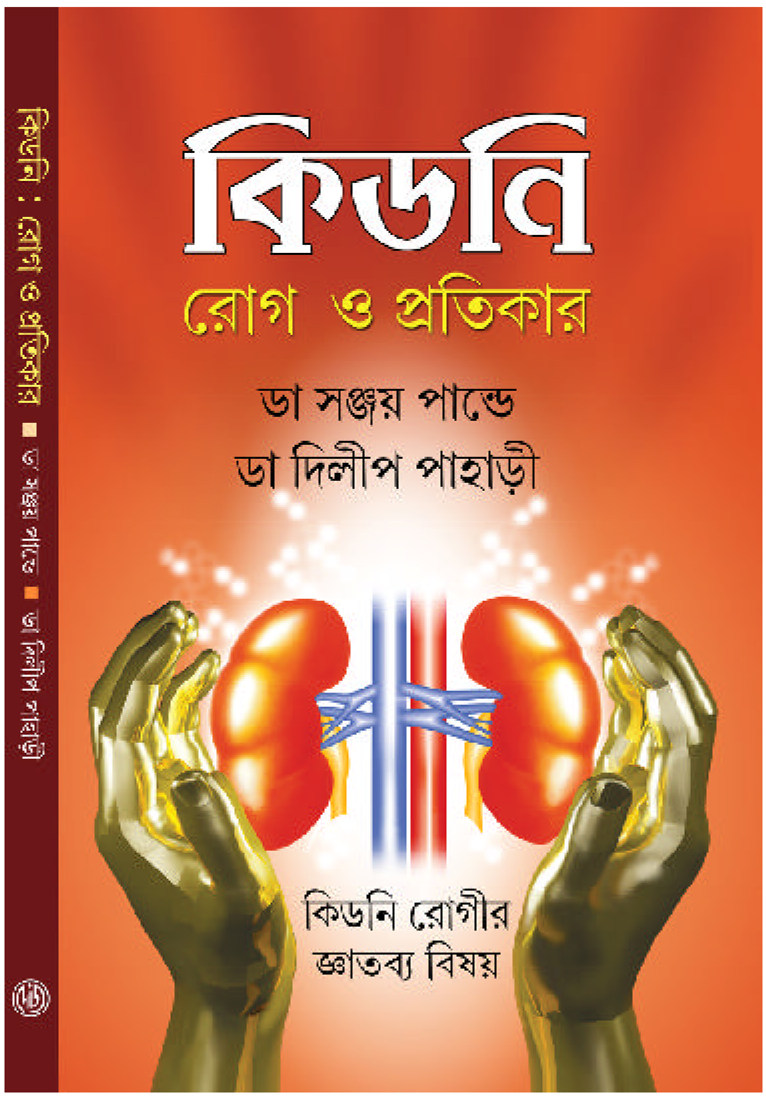
কিডনি
রোগ ও প্রতিকার
ডা সঞ্জয় পান্ডে
ডা দিলীপ পাহাড়ী
কিডনি রোগীর
জ্ঞাতব্য বিষয়
কিডনি : রোগ ও প্রতিকার
ডা সঞ্জয় পান্ডে
ডা দিলীপ পাহাড়ী

Free!! Kidney Guide in 10+ Languages at

www.KidneyEducation.com

Free access to read, download and print

200 paged kidney guide in following languages

International Languages

English, Spanish & Chinese

Indian Languages

Hindi, Bengali, Gujarati, Marathi, Telugu,
Malayalam, Kutchi, Tamil, Kannada & Punjabi

কিডনি

রোগ ও প্রতিকার

ডাঃ ষঞ্জয় পানডিয়া

ডাঃ দিলীপ পাহাড়ী

ও

শ্রীমতি পম্পা দত্ত

দে'জ পাবলিশিং
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

KIDNEY : ROG O PRATIKAR
A Bengali Medical Handbook
by Dr. Sanjoy Pandya & Dr. Dilip Pahari
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : 2241-2330/2219-7920 Fax : (033) 2219-2041
e-mail : deyspublishing@hotmail.com
Rs.100.00

ISBN 978-81-295-1614-5

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১২, আশ্বিন ১৪১৯

প্রচ্ছদ : রঞ্জন দত্ত

১০০ টাকা

© Samarpan Kidney Foundation

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন
বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

লেজার সেটিং : লোকনাথ লেজারোগ্রাফার
৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক : সুভাষচন্দ্র দে, বিসিডি অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

Kidney Website in 10 + Languages www.KidneyEducation.com

কিডনির রোগীদের

এবং

ডাঃ মণি ছেত্রি এবং ডাঃ বিনয় যাকুজা

কে উৎষর্গ করলাম

আসুন কিডনীকে রোগ থেকে বাঁচাই

'কিডনীর সুরক্ষা', এই পুস্তকের মাধ্যমে রোগকে বোঝা এবং প্রতিরোধ করার জন্য মার্গদর্শন করানোই আমার বিনম্র প্রচেষ্টা।

বিগত কিছু বছরের মধ্যে কিডনীর রোগের রোগীর সংখ্যা দ্রুত বাড়তে দেখা যাচ্ছে। খালি, ভারতেই ১০ কোটি লোক কিডনীর রোগের শিকার। কিডনী বিকল রোগীর কিডনী ঠিক করার চিকিৎসা পদ্ধতি এখনও উপলব্ধ নয়। এইসব রোগীর ক্ষেত্রে, কিডনী বিকল হবার নির্ণয় যদি রোগের প্রথম অবস্থাতেই করা সম্ভব হয় তাহলে রোগীর চিকিৎসা অনেক কম খরচে সম্ভব এবং রোগীর দীর্ঘদিন রোগমুক্ত রাখা সম্ভব। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে কিডনী রোগের লক্ষণ এবং রোগ সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব আছে। ফলে, প্রথম অবস্থায় রোগনির্ণয় খুবই কমসংখ্যক রোগীর ক্ষেত্রেই হয়। বাকী রোগীদের কিডনী আরও খারাপ হতে থাকে, তখন ডায়ালিসিস এবং কিডনী প্রতিস্থাপনের মত উপায় অতি আবশ্যক হয়ে পরে। কিন্তু এইসব চিকিৎসার ব্যায়ভার বহন করা রোগী বা তার পরিবারের পক্ষে খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। সুতরাং কিডনীর রোগের প্রতিরোধ এবং রোগ হবার পর তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা শুরু করাই কিডনীর রোগ থেকে বাঁচার একমাত্র পথ।

আজকের বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রত্যেক মানুষেরই কিডনীর রোগ থেকে মুক্ত থাকার প্রয়োজন। মানুষকে এই ব্যাপারে সজাগ করাই এই বই লেখার প্রধান উদ্দেশ্য।

কিডনীর রোগের কথা শুনলেই রোগীর বা তার পরিবারের লোকজনের হৃৎস্পন্দন বেড়ে যায়। স্বাভাবিক ভাবেই কিডনীর রোগী বা পরিবারের লোকজন রোগ ধরার পরার পরে রোগের ব্যাপারে যথাসাধ্য জানার চেষ্টা করোন, কিন্তু ডাক্তারবাবুরা রোগীদের চিকিৎসায় এত ব্যস্ত থাকেন যে তাঁদের পক্ষে প্রত্যেক রোগীকে বিশদ বিবরণ দেবার সময় পান না। আমার পুরো বিশ্বাস, এই পুস্তক রোগী এবং ডাক্তারের মধ্যে সেতুবন্ধন ঘটাবে। এই পুস্তকে কিডনীর সমস্ত রোগের লক্ষণ, নির্ণয়, প্রতিরোধ এবং চিকিৎসার বিশদ বিবরণ আছে। এছাড়াও কিডনীর রোগীদের ভোজনপ্রণালীর ব্যাপারেও বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে। কিন্তু

প্রত্যেক পাঠকের এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই পুস্তকে বর্ণত সমস্ত তথ্য / বিবরণ / উপায় ডাক্তারের পরামর্শ বা চিকিৎসার বিকল্প নয়। এই পুস্তক থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান ডাক্তারের চিকিৎসার সঙ্গে চলা সাহায্য মাত্র। এই পুস্তক পড়ার পরে চিকিৎসা পদ্ধতিতে স্ব-পরিবর্তন বিপজ্জনক হতে পারে।

ডাঃ দিলীপ কুমার পাহাড়ি
শ্রীমতি পম্পা দত্ত
ডাঃ সঞ্জয় পানডিয়া

সূ চি

বিভাগ—১

অধ্যায়	১.	ভূমিকা	১
অধ্যায়	২.	কিডনির অবস্থান এবং কার্যপ্রণালী	৩
অধ্যায়	৩.	কিডনির রোগের লক্ষণ	৯
অধ্যায়	৪.	কিডনির রোগের নির্ণয়	১০
অধ্যায়	৫.	কিডনির রোগ	১৫
অধ্যায়	৬.	কিডনির রোগ সম্বন্ধে প্রচলিত ভুল ধারণা এবং বাস্তব সত্যতা	২১
অধ্যায়	৭.	কিডনির সুরক্ষার উপায়	২৬

বিভাগ—২
কিডনির প্রধান প্রধান রোগ এবং চিকিৎসা :

অধ্যায়	৮.	কিডনি ফেলিওর কী?	৩০
অধ্যায়	৯.	অ্যাকিউট কিডনি ফেলিওর	৩২
অধ্যায়	১০.	ক্রনিক কিডনি ডিজিজ - কারণ	৩৭
অধ্যায়	১১.	ক্রনিক কিডনি ডিজিজ - লক্ষণ এবং নির্ণয়	৩৯
অধ্যায়	১২.	ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের চিকিৎসা	৪৩
অধ্যায়	১৩.	ডায়ালিসিস	৫০
অধ্যায়	১৪.	কিডনি প্রতিস্থাপন	৬৭

অধ্যায়	১৫. ডায়াবিটিস এবং কিডনি	৮০
অধ্যায়	১৬. বংশানুক্রমিক রোগ : পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ	৮৫
অধ্যায়	১৭. কেবলমাত্র একটি কিডনি শরীরে	৮৯
অধ্যায়	১৮. কিডনি ও উচ্চ রক্তচাপ	৯১
অধ্যায়	১৯. মূত্রমার্গের সংক্রমণ	৯৫
অধ্যায়	২০.পাথর রোগ	১০০
অধ্যায়	২১.প্রস্টেটের সমস্যা - বি. পি. এইচ.	১০৯
অধ্যায়	২২. ওষুধ থেকে উদ্ভুত কিডনির সমস্যা	১১৫
অধ্যায়	২৩. অ্যাকিউট গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস্	১১৮
অধ্যায়	২৪. নেফ্রোটিক সিনড্রোম্	১২১
অধ্যায়	২৫. শিশুদের কিডনী এবং মুত্রমার্গের সংক্রমণ	১২৮
অধ্যায়	২৬. বিছানায় প্রস্রাব করা	১৩৭
অধ্যায়	২৭. ক্রনিক কিডনী ডিসিজের রোগীদের খাদ্য-পানীয়	১৪২

ডাঃ দিলীপ কুমার পাহাড়ি, এম ডি, ডি এন বি, নেফ্রলজি,
মেডিকো সুপার স্পেসালিটি হাসপাতাল, কলকাতা
১৯৭৮ সালে MBBS এবং ১৯৮২ সালে MD পাশ করেন।
১৯৮৮ সালে DNB পাশ করেন।
তারপরে উনি পি জি হাসপাতালের প্রফেসর ছিলেন।
১৯৯৪ সালে উনি সরকারি হাসপাতালে ট্রান্সপ্লান্ট শুরু করেন।
২০০২ সালে পি জি হাসপাতালে DM কোর্স চালু করেন।
হিমো ডায়ালিসিস, ট্রান্সপ্লান্ট এবং পেরিটনিয়াল ডায়ালিসিস-এর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। একই ডায়ালিসিস সেন্টার-এ ৪০০০-এরও বেশি ডায়ালিসিস উনি প্রতি মাসে করে থাকেন।

শ্রীমতি পম্পা দত্ত,
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০৫ সালে শিক্ষাবিজ্ঞানে (Education) এম এ এবং ২০০৮ সালে বি এড পাশ করেন। বর্তমানে উনি আমেদাবাদ শহরে থাকেন।
এই বইটির বঙ্গানুবাদ উনি করেছেন এবং সহজ সরল ভাষায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের বক্তব্য উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন যাতে অধিক সংখ্যক মানুষ কিডনির রোগের ব্যাপারে জানতে ও বুঝতে পারেন। মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করাই হলো ওনার মুখ্য প্রচেষ্টা।

ডাঃ সঞ্জয় পানডিয়া, এম. ডি., ডি. এন. বি. নেফ্রলজি,
ডাঃ সঞ্জয় পানডিয়া রাজকোট, গুজরাটের (ভারত) একজন অভিজ্ঞ কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ, উনি এম. ডি. মেডিসিনস-এর ডিগ্রী ১৯৮৬ সালে এম. পি. শাহ. মেডিকেল কলেজ, জামনগর থেকে অর্জন করেন এবং ডি. এন. বি. নেফ্রোলজি ডিগ্রী ১৯৮৯ সালে ইন্সটিটিউট অফ কিডনি ডিসিজ এন্ড রিসার্চ সেন্টার থেকে অর্জন করেন। ১৯৯০ সাল থেকে উনি একজন কিডনি বিশেষজ্ঞ হিসাবে রাজকোট-এ প্র্যাকটিস করে চলেছেন। ডাঃ সঞ্জয় পানডিয়া কিডনির রোগীদের সচেতনতা বাড়ানোর অবিরাম প্রয়াস করে চলেছেন। কিডনি রোগের ব্যাপারে সাধারণ মানুষের জন্য বই উনিই প্রথম গুজরাটি এবং হিন্দী ভাষায় লেখেন।

মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে এবং কিডনির রোগকে প্রতিরোধ করার উদ্দেশে উনি ''কিডনি এডুকেশান ফাউনডেশান'' নামক সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেন।

বেশি সংখ্যক মানুষকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে ডাঃ সঞ্জয় পানডিয়া ভারতে প্রথম গুজরাটি এবং হিন্দী ভাষায় কিডনির ব্যাপারে ওএবসাইট-এর প্রকাশন করেন ২০১০ সালে। ২০১২ সালে ইংরাজি ভাষায় প্রকাশ করেন। ২০১১ সালে স্বনামধন্যা চিকিৎসক ডা. জ্যোৎস্না জপের (মুম্বাই) সহযোগিতায় মারাঠি ভাষায় কিডনির বই এবং ওএবসাইট-এর প্রকাশ করেন। ২০১২ সালে হায়দ্রাবাদের বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ এস. কৃষ্ণন-এর সহযোগিতায় তেলেগু ভাষায় ওএবসাইট এবং বই-এর প্রকাশ করেন। ৫টি বিভিন্ন ভাষায় ১৮ মাসের মধ্যে ওএবসাইট-এ ৩.৮ মিলিয়ন হিট রেকর্ড হয়।

ডাক্তারদের জন্য ডাঃ সঞ্জয় পানডিয়া ''প্র্যাকটিক্যাল গাইডলাইন অন ফ্লুইড থেরাপি'' নামক বই লিখেছেন। এই বইটিই হলো কোনো ভারতীয় লেখক দ্বারা লিখিত প্রথম ফ্লুইড থেরাপি, এসিড বেস ডিসঅডার এবং পানেটেরাল নিউট্রিশান-এর একটি সম্পূর্ণ গাইড। ৩৬০০০-এরও বেশি সংখ্যক বই বিক্রি হয়ে গেছে প্রকাশনার পর থেকে। ডাঃ পানডিয়া চিকিৎসা বিদ্যার ছাত্রদের এবং অন্যান্য ডাক্তারদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় ব্যক্তি কারণ তিনি খুব সহজভাবে এবং বাস্তব বুদ্ধি সহকারে উপরোক্ত বিষয়টির অধ্যাপনা করে থাকেন।

এই বইটিকে কিভাবে ব্যবহার করবেন?

এই বইটি দুই ভাগে বিভক্ত—

প্রথম ভাগ :

কিডনির রোগ ও তার প্রতিকারের বিষয়ে সাধারণ জ্ঞানের বিবরণ। প্রত্যেককে এই ভাগটি অবশ্যই পড়তে পরামর্শ দেওয়া হয়। এই ভাগের বর্ণিত তথ্য একজন সাধারণ মানুষকে কিডনি ডিসিজ-এর প্রাথমিক অবস্থায় নির্ণয় ও প্রতিরোধের বিষয়ে সচেতন করে তোলে।

দ্বিতীয় ভাগ :

এই ভাগটি প্রয়োজনে বা কৌতুহলে পাঠ করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

- কিডনির মুখ্য রোগ তার লক্ষণ, নির্ণয়, প্রতিরোধ এবং চিকিৎসার বিশদ বিবরণ।
- কিডনির ক্ষতি করো এমন রোগের (যেমন ডায়াবিটিস, উচ্চ রক্তচাপ, পলিসিসটিক কিডনি ডিসিজ ইত্যাদি) প্রতিরোধ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য।
- ক্রনিক কিডনি ডিসিজ-এর রোগীদের খাদ্য ও পানীয়র বিশদ বিবরণ।

এই বই-এর বর্ণিত তথ্য চিকিৎসার পরামর্শ নয়।
ডাক্তার-এর পরামর্শ ছাড়া ওষুধ সেবন হানিকারক পারে।

এই বই-এর বর্ণিত তথ্য চিকিৎসার পরামর্শ নয়। ডাক্তার-এর পরামর্শ ছাড়া ওষুধ সেবন হানিকারক পারে।

প্রথম ভাগ

কিডনির বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান

- কিডনির অবস্থান ও কার্য প্রণালী।
- কিডনির রোগের লক্ষণ ও নির্ণয়।
- কিডনির রোগের ব্যাপারে প্রচলিত ভুল ধারণা।
- কিডনির রোগের প্রতিরোধ।

অধ্যায় ১.
ভূমিকা

সুন্দর, সুস্থ, সবল ও নীরোগ থাকতে কে না চায়? শরীরের বাইরের পরিচ্ছন্নতা আপনার হাতে, কিন্তু শরীরের ভিতরের পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব কিডনির (বৃক্ক) এবং লিভারের (যকৃৎ)। যকৃৎ শরীর থেকে বিভিন্ন দূষিত পদার্থ যৌগ সহকারে পিত্ত মারফত নির্গত করে। কিডনি অনাবশ্যক ক্ষতিকারক পদার্থসমূহ শরীর থেকে দূর করার গুরুত্বপূর্ণ কার্য করে।

কিডনির রোগে পীড়িত রোগীর সংখ্যা বিগত কয়েক বছরে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ডায়াবিটিস (মধুমেহ) আর উচ্চ রক্তচাপের রোগীর সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়াই কিডনি বিকল রোগীর সংখ্যাবৃদ্ধির মুখ্য কারণ।

এই বইয়ের মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যক্তিকে কিডনির বিষয়ে জ্ঞান, তথ্যাদি, নির্দেশাবলি যথাসম্ভব প্রদান করার চেষ্টা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে কিডনির রোগের লক্ষণ, প্রতিকার তথা প্রতিরোধের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান প্রদান করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই পুস্তকের বিভিন্ন অধ্যায়ে সহজ সরল ভাষায় কিডনির রোগ থেকে বাঁচার উপায়, কিডনির রোগের ব্যাপারে প্রচলিত কুসংস্কার দূর করার, ডায়ালিসিস, কিডনি প্রতিস্থাপন, ক্যাডাভার প্রতিস্থাপন, আহার এবং সাধারণ নির্দেশাবলির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। যাতে বিনা অসুবিধায় পাঠক সরলভাবে পুস্তকটি পড়তে পারেন সেজন্য পুস্তকের শেষে মেডিক্যাল শব্দাবলি আর সংক্ষিপ্ত শব্দগুলির অর্থ দেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষ এবং কিডনির রোগীদের এই পুস্তক কিডনির রোগ সম্পর্কে সচেতন হতে সাহায্য করবে।

কিডনির বিষয়ে জানুন এবং কিডনির রোগ প্রতিরোধ করুন

অধ্যায় ২.

কিডনির অবস্থান এবং কার্যপ্রণালী

কিডনি (বৃক্ক) মানব শরীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। কিডনির তুলনা সুপার কম্পিউটারের সঙ্গে করা উচিত কারণ কিডনির গঠন এবং কার্য অতীব জটিল।

কিডনি শরীরের রক্ত পরিষ্কার করে মূত্র তৈরি করে। শরীর থেকে মূত্র নিষ্কাশন করার কার্য মূত্রবাহিনী (Ureter) মূত্রাশয় (Urinary Bladder) আর মূত্রনালিকা (Urethra) দ্বারা হয়ে থাকে।

- স্ত্রী ও পুরুষ দুজনের শরীরেই সাধারণত দুটি কিডনি থাকে। কিডনি পেটের ভিতরে, পিঠের দিকে, মেরুদন্ডের দুই পাশে কোমরের অংশে অবস্থিত।
- কিডনির আকার সিম বীজের মতো হয়। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির কিডনি সাধারণত ১০ সেন্টিমিটার লম্বা, ৫ সেন্টিমিটার চওড়া আর ৪ সেন্টিমিটার মোটা হয়। প্রতিটি কিডনির ওজন ১৫০-১৭০ গ্রামের মধ্যে হয়।
- কিডনির দ্বারা প্রস্তুত মূত্র মূত্রাশয় পর্যন্ত মূত্রবাহিনী নালী দ্বারা পৌঁছায়। মূত্রবাহিনী নালী সাধারণত ২৫ সেন্টিমিটার লম্বা হয় আর বিশেষ প্রকারের রাবার জাতীয় (Elastic) মাংসপেশী দ্বারা তৈরি হয়।
- মূত্রাশয় পেটের নীচের অংশে সামনের দিকে (তলপেট) অবস্থিত একটি স্নায়বিক থলি, যার মধ্যে মূত্র জমা হয়।
- যখন মূত্রাশয়ে ৩০০-৪০০ মিলিলিটার (ml) মূত্র জমা হয় তখন মূত্রত্যাগের বেগ আসে। মূত্রনালিকা দ্বারা মূত্র শরীর থেকে বাইরে আসে।

স্ত্রী ও পুরুষের ক্ষেত্রে কিডনির অবস্থান এবং কার্যপ্রণালী একই হয়

কিডনির অবস্থান এবং গঠন

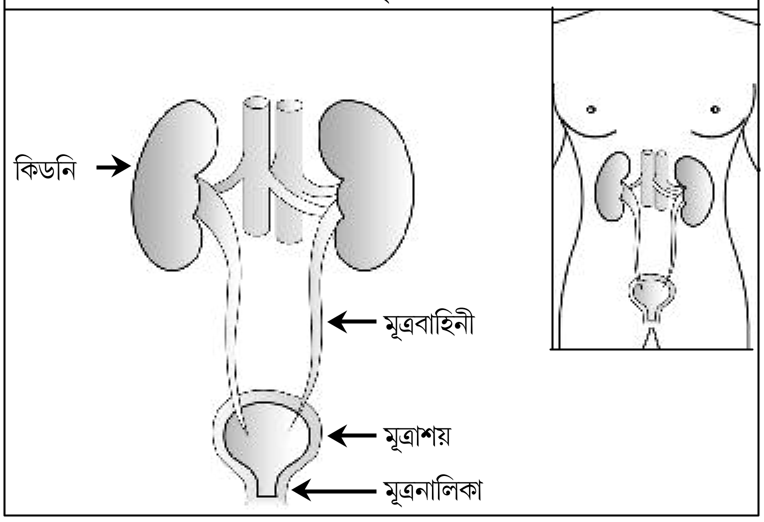

কিডনির কার্যপ্রণালী :

কিডনির প্রয়োজন এবং গুরুত্ব :

- প্রত্যেক ব্যক্তির আহারের ধরন ও মাত্রা প্রতিদিন পরিবর্তিত হয়।
- আহারের মধ্যে বৈচিত্র্যের কারণে শরীরে জল, অম্ল ও ক্ষারের মাত্রা নিরন্তর পরিবর্তিত হয়।
- আহারের পাচন প্রক্রিয়ার সময় অনেক অনাবশ্যক পদার্থ শরীরে উৎপন্ন হয়।
- শরীরে জল, অম্ল বা ক্ষারের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের মাত্রার ভারসাম্য নষ্ট না হলে তা মানুষের পক্ষে হানিকারক বা মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

- কিডনি শরীর থেকে অনাবশ্যক দ্রব্য বা পদার্থ মূত্র হিসাবে শরীর থেকে বের করে রক্তের পরিশোধন করে এবং শরীরে ক্ষার এবং অম্লের ভারসাম্য বজায় রাখে। এইভাবে কিডনি শরীরকে স্বচ্ছ এবং সুস্থ রাখে।

কিডনির প্রধান কার্য কী?

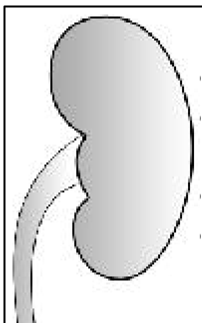

কিডনির কাজ

রক্তের পরিশোধন

শরীরে জল, অম্ল এবং ক্ষারের ভারসাম্য

রক্তচাপ

রক্তকণিকা এবং ক্যালসিয়াম-এর নিয়ন্ত্রণ করে।

কিডনির প্রধান কার্যগুলি হল :

১. রক্তের পরিশোধন :

কিডনি নিরলসভাবে সর্বক্ষণ শরীরে উৎপন্ন অনাবশ্যক পদার্থগুলিকে মূত্রদ্বারা শরীর থেকে দূর করে।

২. শরীরে জলের ভারসাম্য বজায় রাখা :

কিডনি শরীরের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল মূত্রদ্বারা শরীর থেকে বাইরে বের করে।

৩. অম্ল এবং ক্ষারের ভারসাম্য বজায় রাখা :

কিডনি শরীরে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্লোরাইড, ম্যাগনেশিয়াম, ফসফেটস, বাই কার্বনেট ইত্যাদির মাত্রা যথাযথ রাখার কাজ করে। সোডিয়ামের মাত্রা বাড়া বা কমার সঙ্গে মাথার উপর, আর পটাশিয়ামের মাত্রা বাড়া-কমার সঙ্গে হৃদয় বা স্নায়ুতন্ত্রের গতিবিধির গভীর প্রভাব পড়তে পারে।

৪. রক্তচাপের নিয়ন্ত্রণ :

কিডনি অনেক হরমোন নিঃসরণ করে যেমন অ্যানজিওটেনসিন, অ্যালডোস্টেরন, প্রোস্টাগ্ল্যানডিন।

এই হরমোনগুলির সাহায্যে শরীরে জলের মাত্রা, অম্ল এবং ক্ষারের ভারসাম্য বজায় থাকে। এই ভারসাম্যের দ্বারা কিডনি শরীরে রক্তচাপ বজায় রাখার কাজ করে।

মূত্রসৃষ্টির প্রক্রিয়া
কিডনিতে প্রতি মিনিটে ১২০০ এম. এল, আর পুরো দিনে ১৭০০ লিটার রক্ত পৌঁছায়।
↓
গ্লোমেরুলাই প্রত্যেক মিনিটে ১২৫ এম. এল, আর পুরো দিনে ১৮০ লিটার মূত্র সৃষ্টি করে।
↓
টিউবিউলস দ্বারা ৯৯% (১৭৮ লিটার) পদার্থ পুনরায় শোষিত (Reabsorption) হয়।
↓
অবশিষ্ট ১ থেকে ২ লিটার মূত্র দ্বারা শরীর থেকে অপ্রয়োজনীয় পদার্থ বের করা হয়।

৫. রক্তকণিকা উৎপাদনে সাহায্য : রক্তে উপস্থিত লোহিত রক্ত কণিকায় (RBC) সৃষ্টি এরিথ্রোপোয়েটিন হরমোনের সাহায্যে অস্থিমজ্জাতে (Bone Marrow) হয়। এরিথ্রোপোয়েটিন কিডনি দ্বারা প্রস্তুত হয়। কিডনি বিকল (Fail) হলে এই হরমোনের নিঃসরণ কমে যায় বা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়, যারা ফলে রক্ত ফ্যাকাসে হয়ে যায়, যাকে অ্যানিমিয়া (রক্ত কমে যাওয়ার রোগ) বলে।

৬. হাড়ের স্বাস্থ্য : কিডনি সক্রিয় ভিটামিন-'ডি', তৈরি করতে সাহায্য করে থাকে। এই ভিটামিন-'ডি', শরীরে ক্যালসিয়াম আর ফসফরাসের জরুরি মাত্রা বজায় রেখে হাড় এবং দাঁতের বিকাশ ও মজবুত করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কার্য করে থাকে।

কিডনিতে রক্তের পরিশোধনের পরে মূত্র কীভাবে সৃষ্টি হয়?

ারাদিনে কত পরিমাণ মূত্র তৈরি হবে তা নির্ভর করে (১) কত পরিমাণ জলপান করি (২) শরীরে জলের মাত্রা (৩) শরীরে হরমোন ADH-এব মাত্রার উপর (৪) কিডনির সুস্থতার উপর। কিডনি যদি অসুস্থ হয় এবং GFR (Glomerular Filtration Rate) কমে; তখন মূত্র তৈরি করার ক্ষমতাও কমে।

কিডনি প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহকে রেখে অপ্রয়োজনীয় পদার্থগুলিকে মূত্রদ্বারা শরীরের বাইরে বের করে। এটি একটি অনন্য, অদ্ভুত তথা জটিল প্রক্রিয়া।

▲ আপনি কি জানেন?

শরীরের কিডনিযুগলে প্রতি মিনিটে ১২০০ মিলিলিটার রক্ত পরিস্রুত হবার জন্য আসে, এটি হৃদয়দ্বারা শরীরে পৌঁছানো রক্তের ২০% এইভাবে আনুমানিক প্রতি ২৪ ঘণ্টাতে ১৭০০ লিটার রক্ত পরিস্রুত হয়।

রক্ত পরিস্রুত একক (Functional Unit) নেফ্রন একটি ছাঁকনির মতো কাজ করে।

প্রত্যেক কিডনিতে দশ লক্ষ নেফ্রন থাকে। নেফ্রন প্রধানত দুটি অংশে বিভাজিত, গ্লোমেরুলাস এবং টিউবিউলস। আপনি জেনে বিস্মিত হবেন যে গ্লোমেরুলাস নামক ছাঁকনি প্রত্যেক মিনিটে ১২৫ মিলিলিটার মূত্র সৃষ্টির মাধ্যমে ২৪ ঘন্টাতে মোট ১৮০ লিটার মূত্র সৃষ্টি করে থাকে। এই ১৮০ লিটার মূত্রের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় পদার্থ, ক্ষার এবং বিষাক্ত পদার্থ থাকে। একই সঙ্গে এর মধ্যে প্রয়োজনীয় পদার্থ, যথা গ্লুকোজ এবং অন্য পদার্থও থাকে। গ্লোমেরুলাস দ্বারা সৃষ্ট ১৮০ লিটার মূত্র টিউবিউলসে আসে, যেখানে ৯৯% দ্রব্য পুনঃশোষিত (Reabdorption) হয়।

- **টিউবিউলসে হওয়া পুনঃশোষণকে বুদ্ধিদীপ্ত পুনঃশোষণ বলে কেন?**

ইহার কারণ ১৮০ লিটারের মতো অধিক মাত্রাতে সৃষ্ট মূত্রের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় পদার্থ এবং জল পুনরায় শরীরে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। কেবলমাত্র ১ থেকে ২ লিটার মূত্রের মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় পদার্থ এবং অ্যাসিড (Acid) শরীরের বাইরে নিষ্কাশন করা হয়।

এইভাবে কিডনি দ্বারা নানাবিধ জটিল পরিশোধন প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রস্তুত মূত্র মূত্রবাহী নালিকার দ্বারা মূত্রাশয়ে জমা হয় এবং মূত্র নালিকার দ্বারা শরীরের বাইরে নিষ্কাশিত হয়।

- **সুস্থ স্বাভাবিক ব্যক্তির কি প্রস্রাবের মাত্রা বেশি/কম হতে পারে?**

হ্যাঁ। প্রস্রাবের পরিমাণ জলপান এবং আবহাওয়ার তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। যদি কোনও ব্যক্তি কম জল পান করে তাহলে গাঢ় মূত্র ত্যাগ করে। সারাদিনে (৫০০ ml) মূত্র দূষিত পদার্থ নিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ট। অধিক জল পান করলে অধিক এবং পাতলা মূত্র সৃষ্টি হয়। গ্রীষ্মকালে অত্যধিক ঘাম হবার জন্য প্রস্রাবের মাত্রা কমে যায়, আর শীতকালে ঘাম কম হবার জন্য প্রস্রাবের মাত্রা বেড়ে যায়।

কিডনির প্রধান কার্য হল রক্ত পরিশোধন করা এবং শরীরে ক্ষার এবং জলের ভারসাম্য বজায় রেখে মূত্র সৃষ্টি করা।

সাধারণ জল পান করার পরে যদি কোনও ব্যক্তির মূত্র ৫০০ মিলিলিটার (অর্ধেক লিটার) এর কম অথবা ৩০০০ মিলিলিটার (৩ লিটার)-এর বেশি হয় তাহলে সেটা কিডনির রোগ শুরুর প্রথম লক্ষণ।

২৫০০-৩০০০ মিলিলিটার-এর কম জল পান করার পরেও যদি মূত্র ৩ লিটারের বেশি হয় এবং জল পিপাসা বাড়ে, তাহলে কিডনির অসুখ যেমন ডায়াবেটিস ইনসিপিটাস (Diabetes Insipidus) এই রোগ Diabetes Mellitus থেকে আলাদা।

প্রস্রাবের মাত্রা অত্যধিক কম বা বেশি কিডনি রোগের সংকেত

অধ্যায় ৩.
কিডনির রোগের লক্ষণ

কিডনির নানান ধরনের রোগের লক্ষণ আলাদা আলাদা হয়, যার মধ্যে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি প্রধানত দেখা যায় :

- সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে চোখ ফুলে যাওয়া।
- মুখ এবং পা ফুলে যাওয়া।
- ক্ষুধামান্দ্য, বমি ভাব, দুর্বল ভাব।
- বার বার প্রস্রাবের বেগ, বিশেষ করে রাত্রে।
- কম বয়সে উচ্চ রক্তচাপ
- শারীরিক দুর্বল ভাব, রক্ত ফ্যাকাসে হওয়া।
- অল্প হাঁটার পরে, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হওয়া বা তাড়াতাড়ি ক্লান্তি অনুভব করা।
- ৬ বছর বয়সের পরেও রাত্রে বিছানায় প্রস্রাব করা।
- প্রস্রাব কম আসা।
- প্রস্রাব করার সময় জ্বলন অনুভব করা এবং প্রস্রাবে রক্ত বা পুঁজ-এর উপস্থিতি।
- প্রস্রাব করার সময় কষ্ট হওয়া। ফোঁটা ফোঁটা করে প্রস্রাব হওয়া।
- পেটের মধ্যে গিঁট হওয়া, পা আর কোমরের যন্ত্রণা।

উপরোক্ত লক্ষণগুলির মধ্যে কোনও একটি লক্ষণের উপস্থিতি থাকলে কিডনির রোগের সম্ভাবনা থাকতে পারে, এবং তৎক্ষণাৎ ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়ে চেক-আপ করানো দরকার।

সকালে চোখ এবং মুখ ফুলে যাওয়া, উচ্চ রক্তচাপ, অথবা রক্তাল্পতা কিডনি রোগের সর্বপ্রথম লক্ষণ হতে পারে

অধ্যায় ৪.

কিডনির রোগের নির্ণয়

কিডনির অনেক রোগ-চিকিৎসা খুবই ব্যয়বহুল। জটিল কিন্তু সম্পূর্ণ নিরাময় হয় না। দুর্ভাগ্যবশত অনেক গম্ভীর কিডনির রোগের লক্ষণ শুরুতে কম দেখা যায়। এইজন্য যখনই কিডনির রোগের আশঙ্কা হয়, তখনই বিনা বিলম্বে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে নির্ণয় এবং চিকিৎসা শুরু করা দরকার।

কিডনির পরীক্ষা কাদের করানোর দরকার? কিডনির রোগের সম্ভাবনা অধিক কখন?

১. যে ব্যক্তির কিডনির রোগের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

২. ডায়াবিটিস (মধুমেহ) রোগগ্রস্ত ব্যক্তি।

৩. উচ্চ-রক্তচাপযুক্ত ব্যক্তি (High Blood Pressure)

৪. পরিবারে বংশানুগতিক কিডনি রোগের ইতিহাস।

৫. অনেক দিন ধরে যন্ত্রণা নিবারক (Pain Killer Tablets) ঔষধের সেবন।

৬. রেচনতন্ত্রে জন্মগত রোগ।

৭. ২-৫ বৎসর অন্তর নিয়মিত পরীক্ষা সাধারণের জন্য দরকার।

কিডনির রোগের নির্ণয়ের জন্য আবশ্যক পরীক্ষাগুলি হল :

১. প্রস্রাবের পরীক্ষা :

কিডনি রোগের নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রস্রাব পরীক্ষা অতি প্রয়োজনীয়—

- প্রস্রাবের পুঁজের (Pus) উপস্থিতি মূত্রনালিতে সংক্রমণের নিদর্শন।
- প্রস্রাবের প্রোটিন বা রক্তকণিকার উপস্থিতি গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস এর নিদর্শন।

প্রস্রাবের পরীক্ষা কিডনির রোগের প্রাথমিক নির্ণয়ের জন্য অত্যন্ত জরুরি

- **মাইক্রোঅ্যালবুমিনেবিয়া :**
  প্রস্রাবের এই পরীক্ষাটি ডায়াবিটিসের কারণে কিডনি খারাপ হবার সম্ভাবনা থেকে সর্বপ্রথম এবং সবথেকে তাড়াতাড়ি নির্ণয়ের জন্য অত্যন্ত জরুরি।
- **প্রস্রাবের অন্য পরীক্ষাগুলি হল :**
  (১) প্রস্রাবের টি.বি.র জীবাণুর (Bacteria) পরীক্ষা টি.বি. নির্ণয়ের জন্য।
  (২) ২৪ ঘণ্টার মূত্রে প্রোটিনের মাত্রা (কিডনির ফোলাভাব আর তার চিকিৎসার প্রভাব জানার জন্য)
  (৩) প্রস্রাব কালচার আর সেনসিটিভিটি পরীক্ষা (প্রস্রাব সংক্রমণের জন্য দায়ী ব্যাকটিরিয়া বিষয়ে জানতে আর তার চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধের ব্যাপারে জানতে)
- প্রস্রাবের পরীক্ষার মাধ্যমে কিডনির বিভিন্ন রোগের ব্যাপার জানা যায় কিন্তু প্রস্রাব পরীক্ষার রিপোর্ট স্বাভাবিক (Normal) হওয়া সত্ত্বেও কিডনিতে কোনও রোগ নেই সেটা বলা যায় না।

২. রক্তের পরীক্ষা নিরীক্ষা :

- **রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা :** রক্তে হিমোগ্লোবিনের ঘাটতি (রক্তাল্পতা অ্যানিমিয়া) কিডনি ফেল হবার একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন।
  রক্তাল্পতা শরীরের অন্য কোনও রোগের নিদর্শনও হতে পারে সেজন্য এই পরীক্ষা সর্বদা কিডনির রোগের জন্যই করা হয় এমন নয়।
- **রক্তে ক্রিয়েটিনিন এবং ইউরিয়ার মাত্রা :** এই পরীক্ষা কিডনির কার্যদক্ষতার পরীক্ষা। ক্রিয়েটিনিন আর ইউরিয়া হল শরীরের অনাবশ্যক বর্জ্য পদার্থ, যা কিডনির দ্বারা শরীরের বাইরে নিষ্কাশিত হয়। শরীরের ক্রিয়েটিনিন এর সাধারাণ মাত্রা ০.৬ থেকে ১.৪ মিলিগ্রাম/ডেসিলিটার আর ইউরিয়ার সাধারণ মাত্রা ২০ থেকে ৪০ মিলিগ্রাম/ডেসিলিটার। কিডনিযুগল বিকল হলে দুটিরই মাত্রা বাড়ে। এই পরীক্ষাটিও কিডনি রোগের নির্ণয় এবং চিকিৎসার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- **রক্তের অন্যান্য পরীক্ষা :** কিডনির বিভিন্ন রোগের নির্ণয়ের জন্য রক্তের অন্যান্য পরীক্ষাগুলি হল কোলেস্ট্রোল, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম, ফসফেটস, কমপ্লিমেন্টস ইত্যাদি।

কিডনির কার্যক্ষমতা জানার জন্য রক্তের ইউরিয়া এবং ক্রিয়েটিনিন এর পরীক্ষা করানো দরকার

৩. রেডিওলজিক্যাল পরীক্ষা :

- **কিডনির সোনোগ্রাফি :** এটি একটি সরল, সুরক্ষিত, শীঘ্র পদ্ধতি যার দ্বারা কিডনির আকার, অবস্থান, মূত্রমার্গের অবরোধ, পাথর (Stone) ইত্যাদি ব্যাপারে জানা যায়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ক্রনিক কিডনি ফেলিওর-হলে রোগীর কিডনির সংকোচন এই পরীক্ষার দ্বারা বোঝা যায়। কিডনির Size ছোট হয়ে যায়।)
- **পেটের এক্স-রে :** এই পরীক্ষা মুখ্যত কিডনির স্টোন নির্ণয়ের জন্য করা হয়।
- **ইন্ট্রাভেনাস পাইলোগ্রাফি (আই.ভি.পি) :** এই পরীক্ষাতে রোগীকে এক বিশেষ ধরনের আয়োডিনযুক্ত (রেডিও কনট্রাস্ট পদার্থ) ঔষধের ইনজেকশন দেওয়া হয়। ইনজেকশন দেবার পরে অল্প অল্প সময়ের অন্তরালে পেটের (X-Ray) নেওয়া হয়।

  এই (X-Ray) তে ঔষধ কিডনির মধ্য দিয়ে মূত্রনালিকা দ্বারা মূত্রাশয়ে জমা হতে দেখা যায়।

  আই.ভি.পির দ্বারা কিডনির কার্যক্ষমতা আর মূত্রনালিকার অবস্থানে ব্যাপারে তথ্য পাওয়া যায়। এই পরীক্ষা বিশেষ করে স্টোন, মূত্রনালিতে অবরোধ (obstacle) গাঁট-এর নির্ণয় করা যায়। যখন কিডনি খারাপ হবার পরে কম কাজ করে তখন এই পরীক্ষা কার্যকরী হয় না। রেডিও কনট্রাস্ট ইনজেকশন খারাপ কিডনিকে আরও খারাপ করতে পারে। এই কারণে কিডনি বিকল রোগীদের ক্ষেত্রে এই পরীক্ষা ক্ষতিকারক হতে পারে। আই.ভি.পি একটি X-Ray পরীক্ষা হবার কারণ, গর্ভাবস্থায় থাকা বাচ্চার জন্য হানিকারক হতে পারে। সেজন্য গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে এই পরীক্ষা করা হয় না।
- **অন্য রেডিওলজিক্যাল পরীক্ষা :** কিছু বিশেষ প্রকার কিডনির রোগের জন্য ডপলার, মিক্সইউরেটিং সিস্টোইরেথ্রোগ্রাম রেডিও নিউক্লিয়ার স্টাডি, রেনাল অ্যানজিওগ্রাফি, সি. টি. স্ক্যান, অ্যানটিগ্রেড আর রেট্রোগ্রেড পাইলোগ্রাফি ইত্যাদি পরীক্ষার দ্বারা নির্ণয় করা হয়।

কিডনির সোনোগ্রাফির পরীক্ষা কিডনির রোগবিশেষজ্ঞর কাছে তৃতীয় চোখের কাজ করে

৪. অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা : কিডনি বায়োপসি, দূরবিন দ্বারা মূত্রনালিকার পরীক্ষা, এবং ইউরোডাইনামিক্সের মতো বিশেষ প্রকারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা কিডনির অনেক প্রকার রোগের নির্ণয়ের জন্য বিশেষ প্রয়োজন।

কিডনির বায়োপসি (Kidney Biopsy)

কিডনির বায়োপসি পাতলা সূচ দ্বারা, বিনা সংজ্ঞাহীন করে করা হয়। কিডনির অনেক রোগের কারণ জানতে এই পরীক্ষা অতি গুরুত্বপূর্ণ। এই পরীক্ষা যন্ত্রণারহিত।

কিডনির বায়োপসি কী ?

কিডনির অনেক রোগের কারণ জানতে, সুচের মাধ্যমে কিডনির মধ্য থেকে পাতলা সুতোর মতো অংশ বের করে, তার বিশেষ প্রকার হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল পরীক্ষাকে কিডনির বায়োপসি বলে।

কিডনির বায়োপসির প্রয়োজন কখন হয় ?

প্রস্রাবে প্রোটিনের উপস্থিতি, কিডনি বিকল হওয়ার ফলে কিডনির রোগীদের সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরেও নিশ্চিত রোগ নির্ণয় না হলে, কিডনির বায়োপসি প্রয়োজনীয় হয়।

কিডনির বায়োপসির লাভ কী ?

এই পরীক্ষা দ্বারা কিডনির রোগের সঠিক কারণ জানার পর তার চিকিৎসা সম্ভব হয়। এই পরীক্ষার দ্বারা কী ধরনের চিকিৎসার প্রয়োজন, চিকিৎসা কতটা লাভদায়ক হবে অথবা ভবিষ্যতে কিডনির খারাপ হবার সম্ভাবনা কী প্রকার, তা জানা যায়।

কিডনির বায়োপসি কীভাবে করা হয় ?

কিডনির বায়োপসি করার জন্য রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

- কিডনির বেশ কিছু রোগে প্রস্রাবে প্রোটিন পাওয়া যায়। প্রস্রাবে প্রোটিনের উপস্থিতি কিডনি ফেলের মতো গম্ভীর রোগের প্রাথমিক নিদর্শন। উদাহরণস্বরূপ, ডায়াবিটিসের রোগের কারণে কিডনির ফেল হবার প্রাথমিক অবস্থায় প্রস্রাবে প্রোটিন পাওয়া যায়।

কিডনির অনেক প্রকার রোগ নির্ণয়ের জন্য কিডনির বায়োপসি অতিআবশ্যক পরীক্ষা

- এই পরীক্ষা সুরক্ষিতভাবে করার জন্য রক্তচাপ এবং রক্ততঞ্চন প্রক্রিয়া স্বাভাবিক হওয়া দরকার।
- রক্ত পাতলা করার ওষুধ যেমন অ্যাসপিরিন ইত্যাদি, পরীক্ষা করার দু-সপ্তাহ পূর্বে বন্ধ করা দরকার।
- এই পরীক্ষা প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে সংজ্ঞাহীন (Unconcious) না করে এবং বাচ্চাদের সংজ্ঞাহীন করার পরে করা হয়।
- বায়োপসি করার সময় রোগীকে উপুড় করে শুইয়ে পেটের নীচে বালিশ রাখা হয়।
- বায়োপসি করার জন্য নিশ্চিত জায়গা সোনোগ্রাফির দ্বারা ঠিক করা হয়। কোমরে ঠিক পিঠের পাঁজরের নীচে স্নায়ুতন্ত্রের পাশের জায়গা হল বায়োপসির উপযুক্ত জায়গা।
- বিশেষ প্রকার সুচের দ্বারা (বায়োপসি নিডল) কিডনির থেকে পাতলা সুতোর মতো ২-৩ টি টুকরো বের করে হিস্টোপ্যাথোলজি পরীক্ষার জন্য হিস্টোপ্যাথোলজিস্টের কাছে পাঠানো হয়।
- বায়োপসি করার পরে রোগীকে খাটের উপর বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। বেশিরভাগ রোগীকে দ্বিতীয় দিন ছেড়ে দেওয়া হয়।
- বায়োপসি করার পর ২-৩ সপ্তাহ পর্যন্ত রোগীদের বেশি পরিশ্রমের কাজ না করার পরামর্শ দেওয়া হয়, বিশেষ করে ভারী বস্তু তুলতে মানা করা হয়।
- বায়োপসি করার আগে রক্তের জমাট বাঁধার ক্ষমতা আছে কি না দেখা দরকার (prothrombin time/INR)।
- বায়োপসি করার পরে মূত্র পরিষ্কার থাকলে (No hematuria), রোগীকে ২-৩ ঘণ্টার মধ্যে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে।

কিডনির রোগগুলিকে প্রধানতঃ দুভাগে বিভক্ত করা যায় :

বায়োপসি শুধুমাত্র ক্যানসার-এর নির্ণয়ের জন্য করা হয়- এটা ভুল ধারণা

অধ্যায় ৫.
কিডনির রোগ

কিডনির রোগগুলিকে প্রধানত দুভাগে বিভক্ত করা যায় :

● **মেডিক্যাল রোগ (ঔষধ সমন্বিত) :** এই প্রকার রোগের চিকিৎসা নেফ্রোলজিস্ট ঔষধের দ্বারা করে থাকেন। কিডনি বিকল রোগীদের ডায়ালিসিস বা কিডনি প্রতিস্থাপনের দরকার হতে পারে।

● **সার্জিক্যাল রোগ (অপারেশন সমন্বিত) :** এই প্রকার রোগের চিকিৎসা ইউরোলজিস্ট করে থাকেন। এক্ষেত্রে, সাধারণ অপারেশন, দূরবিন দ্বারা পরীক্ষা—এন্ডোস্কোপি, বা লেজারের দ্বারা পাথর ভাঙা—লিথোট্রিপসি ইত্যাদির প্রয়োগ করা হয়।

● **নেফ্রোলজিস্ট ও ইউরোলজিস্টের মধ্যে পার্থক্য কী?**
কিডনি বিশেষজ্ঞ ফিজিশিয়ানকে নেফ্রোলজিস্ট বলে, যিনি ওষুধের দ্বারা চিকিৎসা এবং ডায়ালিসিস দ্বারা রক্ত পরিশোধন করেন। আর, কিডনি বিশেষজ্ঞ সার্জেনকে ইউরোলজিস্ট বলে। যিনি সাধারণত অপারেশন এবং দূরবিন এর মাধ্যমে রোগের চিকিৎসা করেন।

কিডনির প্রধান রোগ	
মেডিক্যাল রোগ	**সার্জিক্যাল রোগ**
কিডনি ফেলিওর	মূত্রনালিকাতে পাথর
উচ্চ রক্তচাপ	প্রস্টেটের রোগ
ডায়াবেটিস থেকে কিডনির অসুখ	মূত্রনালিকাতে জন্মগত অসুখ
নেফ্রোটিক সিনড্রোম	মূত্রনালিকার/কিডনির ক্যান্সার
প্রস্রাবের সংক্রমণ রোগ	কিডনি প্রতিস্থাপন

প্রস্টেটের রোগ SLE এবং অন্যান্য নেফ্রাইটিস ৯০% ঔষধের দ্বারা চিকিৎসা সম্ভব

অ্যাকিউট কিডনি ফেলিওরে কিডনিযুগল হঠাৎ খারাপ হয়, কিন্তু চিকিৎসার পরে পুরোপুরি ঠিক হয়ে যায়।

কিডনি ফেলিওর

কিডনি ফেলিওর এর অর্থ হল, কিডনিযুগলের কার্যক্ষমতা কমে যাওয়া। রক্তে ক্রিয়েটিনিন আর ইউরিয়ার বর্ধিত মাত্রা কিডনি ফেলিওরের সংকেত দেয়। কিডনি ফেলিওর দুইপ্রকারের হয়—১. অ্যাকিউট কিডনি ফেলিওর ২ ক্রনিক কিডনি ফেলিওর।

• অ্যাকিউট কিডনি ফেলিওর (Acute Kidney Injury/Failure) :

অ্যাকিউট কিডনি ফেলিওর-এর অর্থ হল স্বাভাবিক কার্যরত কিডনি অল্প সময়ের মধ্যে, হঠাৎ খারাপ হয়ে যায়। অ্যাকিউট কিডনি ফেলিওর হবার মূল কারণ বমি-পায়খানা, ম্যালেরিয়া, রক্তচাপ হঠাৎ করে কমে যাওয়া ইত্যাদি। সঠিক ওষুধ এবং দরকার হলে ডায়ালিসিসের মাধ্যমে এইভাবে খারাপ হওয়া কিডনি পুনরায় ঠিকভাবে কাজ করতে শুরু করে।

• ক্রনিক কিডনি ফেলিওর :

ক্রনিক কিডনি ফেলিওর **(Chronic Kidny Disease CKD)** এ কিডনিযুগল ধীরে ধীরে দীর্ঘ সময় ধরে এমনভাবে খারাপ হয় যে, পুনরায় ঠিক হয় না। শরীরে ফোলা ভাব, ক্ষুধামান্দ্য, বমিভাব, বিরক্তিভাব, দুর্বলতা, অল্প বয়সে উচ্চরক্তচাপ ইত্যাদি এই রোগের মুখ্য লক্ষণ। ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের মুখ্য কারণগুলি হল, ডায়াবিটিস, উচ্চ রক্তচাপ এবং কিডনির অন্যান্য নানাবিধ রোগ। রক্তে ক্রিয়েটিনিন এবং ইউরিয়ার মাত্রার দ্বারা কিডনির কার্যক্ষমতা বোঝা যায়। কিডনি বেশি খারাপ হলে রক্তে ক্রিয়েটিনিন এবং ইউরিয়ার মাত্রা বাড়ে।

এই রোগের প্রাথমিক চিকিৎসা ঔষধ আর খাদ্য এবং পানীয়ের উপর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে করা হয়। এই চিকিৎসার উদ্দেশ্য হল কিডনিকে অধিক খারাপ হওয়ার হাত থেকে বাঁচানো এবং ওষুধের মাধ্যমে রোগীর স্বাস্থ্য দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ঠিক রাখা।

কিডনি বেশি খারাপ হলে সাধারণত, ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা ৮-১০ মিলিগ্রাম/ডেসিলিটার-এর বেশি হয়, তখন ঔষধ এবং খাদ্য-পানীয়তে নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও রোগীর স্বাস্থ্য খারাপ হতে থাকে। এমত অবস্থায় চিকিৎসার কেবলমাত্র দুটি বিকল্প খোলা থাকে। ডায়ালিসিস (রক্তের ডায়ালিসিস বা পেটের মধ্যে ডায়ালিসিস) অথবা কিডনি প্রতিস্থাপন।

ক্রনিক কিডনি ফেলিওরে কিডনিযুগল ধীরে ধীরে দীর্ঘ সময় ধরে এমনভাবে খারাপ হয় যে, পুনরায় আর ঠিক হয় না

• ডায়ালিসিস :

কিডনিযুগল যখন অত্যধিক খারাপ হয়ে যায়, তখন শরীরের অনাবশ্যক পদার্থকে শরীর থেকে দূর করার প্রক্রিয়াকেই ডায়ালিসিস বলে।

• হিমোডায়ালিসিস (মেশিন দ্বারা রক্তের পরিশোধন) :

এই ধরনের ডায়ালিসিসে হিমোডায়ালিসিস মেশিনের মাধ্যমে কৃত্রিম কিডনির (ডায়ালাইজার) রক্ত পরিশোধন করা হয়। এ. ভি. ফিস্টুলা অথবা ডবল লুমেন ক্যাথিটার-এর মাধ্যমে পরিশোধনের জন্য রক্ত শরীর থেকে বের করা হয়। মেশিনের সাহায্যে শুদ্ধ রক্ত পুনরায় শরীরে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য রোগীকে নিয়মিতরূপে সপ্তাহে দুই থেকে তিনবার হিমোডায়ালিসিস করানো দরকার। হিমোডায়ালিসিস চলাকালীন রোগী খাটের উপর আরামে স্বাভাবিক অল্পসল্প কাজকর্ম যেমন জলখাবার খাওয়া, টিভি দেখা ইত্যাদি করতে পারে নিয়মিত রূপে ডায়ালিসিস করালে রোগী স্বাভাবিক জীবন কাটাতে পারে। কেবলমাত্র ডায়ালিসিস করানোর জন্য রোগীকে হাসপাতালে হিমোডায়ালিসিস ইউনিটে আসতে হতে পারে, যেখানে চার ঘন্টার মধ্যে এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়।

বর্তমানে, হিমোডায়ালিসিস করানো এমন রোগীর সংখ্যা, পেটের ডায়ালিসিস করানো (সি. এ. পি. ডি) রোগীর সংখ্যার থেকে অনেক বেশি।

• পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস :

পেটের ডায়ালিসিস (সি. এ. পি. পিডি) এই পদ্ধতিতে রোগী তার বাড়িতেই বিনা মেশিনে ডায়ালিসিস করাতে পারে। সি. এ. পি. ডি-তে বিশেষ ধরনের নরম এবং অনেক ছিদ্রযুক্ত নালী (ক্যাথিটার) সহজ অপারেশন দ্বারা পেটের মধ্যে ঢোকানো হয়। এই নালীর দ্বারা বিশেষ প্রকারের তরল (P.D.Fluid) পেটে ঢোকানো হয়

বেশ কিছু ঘন্টা পর, যখন এই তরলকে ওই নালীর মধ্য দিয়েই বের করা হয়, তখন ওই তরলের সঙ্গে অনাবশ্যক বর্জ্য পদার্থও শরীরের বাইরে বেরিয়ে যায়। এই পদ্ধতিতে খরচ বেশি হয় এবং পেটে সংক্রমণের সম্ভাবনা থেকে যায়। এই দুইটি কারণই হল সি. এ. পি.'-র প্রধান অসুবিধা।

কিডনি অত্যধিক খারাপ হবার পরে, কিডনির কার্য করার কৃত্রিম পদ্ধতির নাম ডায়ালিসিস

● অ্যাকিউট গোলামেরুলোনেফ্রাইটিস :

যদিও যে কোনও বয়সের মানুষেরই এই রোগ হতে পারে, তথাপি বাচ্চাদের মধ্যে এই রোগ অধিক মাত্রায় পাওয়া যায়। এই রোগ গলাতে সংক্রমণ বা চামড়াতে সংক্রমণের কারণে হয়ে থাকে। মুখ ফুলে যাওয়া এবং লাল রংয়ের প্রস্রাব হওয়া এই রোগের মুখ্য লক্ষণ।

এই রোগ নির্ণয়ের সময় উচ্চ রক্তচাপ, প্রস্রাবে প্রোটিন এবং রক্তকণার উপস্থিতি, আর বেশ কিছু ক্ষেত্রে কিডনি ফেলিওর দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যদি ঠিক সময়ে চিকিৎসা শুরু করে ওষুধ দেওয়া যায় তাহলে অল্পদিনের মধ্যেই এই রোগ পুরোপুরি ঠিক হয়ে যায়। অনেকের এই রোগ পুরোপুরি নাও সারতে পারে। মূত্রে রক্তকণিকা বা বেশি মাত্রায় প্রোটিন থাকলে বুঝতে হবে রোগ সারেনি। কারও কারও মৃত্যুও হতে পারে।

● নেফ্রোটিক সিনড্রোম :

কিডনির এই রোগটিও বাচ্চাদের মধ্যে অধিক দেখতে পাওয়া যায়। এই রোগের মুখ্য লক্ষণ হল বার বার শরীরের ফোলা ভাব। এই রোগে প্রস্রাবে প্রোটিনের উপস্থিতি, রক্তে প্রোটিনের মাত্রা কম, কোলেস্ট্রল বেড়ে যায়। এই রোগে সকলের রক্তচাপ বাড়ে না এবং কিডনি বিকল হবার সম্ভাবনা কম।

এই রোগ ওষুধের দ্বারা নিরাময় সম্ভব। কিন্তু বার বার রোগের প্রকাশ, শরীরের ফোলাভাব, নেফ্রোটিক সিনড্রোমের বিশেষত্ব। এই রোগ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত চলতে থাকা রোগীর এবং তার পরিবারের জন্য পীড়াদায়ক। রোগ যদি না সারে, তাহলে কিডনি খারাপও হতে পারে। কিডনি বায়োপসি দ্বারা বিভিন্ন প্রকার নির্ণয় সম্ভব। Prednisolone ছাড়াও CNI, Mycofenolate এবং Ritaximal ব্যবহারে অনেকের ওষুধে সারে।

● প্রস্রাবে সংক্রমণ :

প্রস্রাব ত্যাগের সময় জ্বালাভাব, বার বার প্রস্রাবের বেগ আসা, লিঙ্গের যন্ত্রণা, জ্বর আসা ইত্যাদি প্রস্রাবে সংক্রমণের লক্ষণ। প্রস্রাব পরীক্ষাতে পুঁজের উপস্থিতি সংক্রমণের প্রমাণ দেয়।

সাধারণত এই রোগ ওষুধের দ্বারা ঠিক হয়ে যায়। শিশুদের ক্ষেত্রে এই রোগের চিকিৎসার সময় বিশেষ সাবধানতার দরকার হয়। শিশুদের প্রস্রাবে সংক্রমণের

বাচ্চাদের কিডনির রোগের মধ্যে গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস হল সর্বাধিক প্রসারিত রোগ

চিকিৎসার নির্ণয়ে বিলম্ব বা সুচিকিৎসা না হলে কিডনির খুবই ক্ষতি হবার (যেটা ঠিক হয় না) সম্ভাবনা থাকে।

যদি প্রস্রাবে বার বার সংক্রমণ হয়, তাহলে মূত্রনালিতে বাধা, মূত্রনালিতে টি.বি. ইত্যাদির নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষা করানো জরুরি। শিশুদের প্রস্রাবে বার বার সংক্রমণের প্রধান কারণ হল ভি. ইউ. আর (ভেসাইকো ইউরেটিক রিফ্লেক্স)। এক্ষেত্রে মূত্রাশয় আর মূত্রবাহিনীর মধ্যের ভালভে জন্মগত অসুবিধা থাকে, যার ফলে প্রস্রাব মূত্রাশয় থেকে উল্টো দিকে মূত্রবাহিনী হয়ে কিডনির দিকে যায়।

- **পাথর রোগ :**

পাথর কিডনির একটি গুরুত্বপূর্ণ রোগ। সাধারণত পাথর কিডনির মূত্রবাহিনী আর মূত্রাশয়ে হয়। এই রোগের মুখ্য লক্ষণগুলি হল অসহ্য পেটের যন্ত্রণা, বমি বমি ভাব, প্রস্রাবের লাল রং ইত্যাদি। কিছু রোগীদের পাথর হওয়া সত্ত্বেও যন্ত্রণা হয় না, থাকে 'সাইলেন্ট স্টোন' বলে। পেটের এক্স-রে এবং সোনোগ্রাফি পাথর নির্ণয়ের জন্য সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। পাথর সন্দেহ হলে CT Scan করানো অবশ্যই দরকার। কিডনির জন্য Creatinine বেশি থাকলে non-contrast করাই দরকার। সোনোগ্রাফিতে অনেক সময় কিডনিতে পাথর মনে হয়, অথচ পাথর নাও থাকতে পারে। আবার ureter-এ পাথর থাকলে তা সোনোগ্রাফিতে ধরা নাও হতে পারে। ছোট আকারের পাথর (৮mm) অধিক জল পান করলে প্রাকৃতিক রূপে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়।

যদি পাথরের কারণে বার বার অসহ্য যন্ত্রণা হয়, বার বার প্রস্রাবে রক্ত আসে, বা পুঁজ আসে, অথবা মূত্রনালিকাতে বাধার সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে কিডনির ক্ষতি হয় তাহলে পাথর বের করে দেওয়া খুবই জরুরি।

সাধারণত পাথর বের করার জন্য প্রচলিত পদ্ধতিগুলি হল লিথোট্রিপসি, দূরবিন অর্থাৎ পি.সি.এন.এল, সিস্টোকোপি আর ইউরেটরেস্কোপি এবং lithoclast (লিথোক্লাস্ট) বা অপারেশনের সাহায্যে পাথর বের করা। ৮০% রোগীদের পাথর আবার হবার সম্ভাবনা থাকে।

এই কারণে, অধিক জল পান করা, খাদ্য পানীয়র উপর নিয়ন্ত্রণ এবং সময়ে সময়ে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে পরামর্শ প্রয়োজনীয় এবং ফলপ্রসূ।

পাথর রোগের মুখ্য লক্ষণ হল অসহ্য পেটের যন্ত্রণা

- **প্রোস্টেট এর রোগ—বি. পি. এইচ :**

প্রোস্টেট গ্রন্থি কেবলমাত্র পুরুষদের মধ্যেই থাকে। মূত্রাশয় থেকে প্রস্রাব নিষ্কাশন করার নালি, মূত্রনালিকার শুরুর অংশ প্রোস্টেটের মধ্য দিয়ে যায়। বয়সকালে পুরুষদের প্রোস্টেটের আকার বড় হয়ে যায়, যার ফলে মূত্রবাহী নালিকার উপর চাপ সৃষ্টি হয় এবং মূত্রত্যাগে কষ্ট হয়, এই অবস্থানকেই বলে প্রোস্টেট গ্রন্থির বৃদ্ধি। গ্রন্থির বৃদ্ধি benign hyperplasia or cancer (Adenocarcinoma) হতে পারে। Prostak Specific Antigen (PSA) প্রোস্টেট গ্রন্থির ক্যান্সারের ক্ষেত্রে ১০ বা তার বেশি হয়। রাত্রে অনেকবার মূত্রত্যাগ করতে ওঠা, প্রস্রাবের ধারা ক্ষীণ হওয়া, প্রস্রাব করতে জোর দেওয়ার প্রয়োজন হওয়া ইত্যাদি হল বি. পি. এইচ-এর লক্ষণ। প্রাথমিক অবস্থায় এই রোগের চিকিৎসা ঔষধের সাহায্যে করা হয়। যদি ঔষধে উপশম না হয় তাহলে দূরবিন দ্বারা (T.U.R.P.) চিকিৎসা করানো দরকার। Infection হলেও PSA ১০-এর বেশি হতে পারে। Infection না থাকলে এবং PSA ১০-এর বেশি হলে, Prostak বায়োপসি করা দরকার। বায়োপসিতেই ধরা cancer পড়ে।

বয়সকালে পুরুষদের প্রস্রাব করতে কষ্ট সৃষ্টিকারী মুখ্য কারণটি হল প্রোস্টেট গ্রন্থির বৃদ্ধি

অধ্যায় ৬.

কিডনির রোগ সম্বন্ধে প্রচলিত ভুল ধারণা এবং বাস্তব সত্যতা

ভুল ধারণা : কিডনির সব রোগই খুব ভয়ঙ্কর।

বাস্তব সত্য : না, কিডনির সব রোগই খুব ভয়ঙ্কর নয়। ঠিক সময়ে নির্ণয় এবং চিকিৎসার দ্বারা বেশিরভাগ রোগই ঠিক হয়ে যায়।

ভুল ধারণা : কিডনি ফেলিওর হলে কেবলমাত্র একটি কিডনিই খারাপ হয়।

বাস্তব সত্য : না, দুটি কিডনিই একসাথে খারাপ হয়। সাধারণত যখন কোনও মানুষের একটি কিডনি খারাপ হয়, তখনও রোগীর কোনও অসুবিধা হয় না। রক্তে ক্রিয়েটিনিন এবং ইউরিয়ার মাত্রাতে কোনও পরিবর্তন হয় না। যখন দুটি কিডনিই খারাপ হয়ে যায় তখন শরীরের অনাবশ্যক বর্জ্য পদার্থ যা কিডনির দ্বারা শরীর থেকে নিষ্কাশিত হয়, শরীর থেকে বের হয় না। যার ফলে রক্তে ক্রিয়েটিনিন এবং ইউরিয়ার মাত্রা বেড়ে যায়। রক্ত পরীক্ষাতে বর্ধিত ইউরিয়া এবং ক্রিয়েটিনিন এর মাত্র কিডনি ফেলিওরের নিদর্শন। একটা কিডনিতে টিউমার, পাথর, infection বা একটা Ureter-এ obstruction একটি কিডনির খারাপ হওয়ার কারণ হতে পারে। তখন সেই কিডনিতে ব্যথা হতে পারে। এইক্ষেত্রে অন্য কিডনি ঠিক থাকলে, রক্তে ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন-এর মাত্রা বাড়বে না।

ভুল ধারণা : কিডনির যে কোনও রোগে, শরীরের ফোলাভাব কিডনি ফেলিওরের সংকেত দেয়।

বাস্তব সত্য : না, কিডনির অনেক রোগে কিডনির কার্যপ্রণালী সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হওয়া সত্ত্বেও শরীরে ফোলাভাব লক্ষ করা যায়। উদাহরস্বরূপ বলা যায় নেফ্রোটিক সিনড্রোম।

ভুল ধারণা : কিডনি ফেলিওরে সমস্ত রোগীরই শরীরে ফোলাভাব দেখা যায়।

বাস্তব সত্য : না, বেশ কিছু রোগীর ক্ষেত্রে দুটি কিডনি খারাপ হবার পরেও রোগীর ডায়ালিসিস করানো সত্ত্বেও ফোলাভাব লক্ষ করা যায় না। সারাংশ হল এই যে, কিডনি ফেলিওরের অধিকাংশ রোগীদের ক্ষেত্রেই ফোলাভাব লক্ষ করা যায়, কিন্তু সমস্ত রোগীদের ক্ষেত্রে নয়।

ভুল ধারণা : এখন আমার কিডনি ঠিক আছে সুতরাং এখন আর ওষুধ খাবার দরকার নেই।

বাস্তব সত্য : ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের কিছু রোগীদের ক্ষেত্রে চিকিৎসার পরে রোগের লক্ষণ সাময়িকভাবে কম হয়। এর ফলে কিছু রোগী রোগহীন হবার ভ্রম করে ফেলে এবং ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দেয়, যার ফল ভবিষ্যতে খারাপ হয়। ওষুধ আর নিয়ন্ত্রণের অভাবে কিডনি তাড়াতাড়ি খারাপ হতে শুরু করে এবং খুব তাড়াতাড়ি ডায়ালিসিস-এর সাহায্য নেবার পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে।

ভুল ধারণা : রক্তে ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা একটু বেশি আছে, কিন্তু শরীর ঠিক আছে, সুতরাং চিন্তা করার বা চিকিৎসা করানোর দরকার নেই।

বাস্তব সত্য : এটা খুবই ভুল ধারণা। ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের রোগীদের শরীরে ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা অল্পসল্প তখনই বাড়ে যখন কিডনিযুগলের কার্যক্ষমতা ৬০ শতাংশ বা তার বেশি কমে যায়। এমতাবস্থায় লক্ষণের অভাবে বেশ কিছু রোগী চিকিৎসা বা ওষুধ সেবনের উপর গুরুত্ব দেয় না। কিন্তু এই অবস্থাতেই ওষুধ এবং চিকিৎসার দ্বারা সর্বাধিক লাভ হয়। এইরকম সময়ই নেফ্রোলজিস্ট দ্বারা দেওয়া ওষুধ দীর্ঘদিন পর্যন্ত কিডনিকে কর্মক্ষম রাখতে সাহায্য করে। সাধারণত, যখন ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা ৫.০ মিলিগ্রাম/ডেসিলিটার এর বেশি হয়ে যায়, তখন কিডনিযুগলের কর্মক্ষমতা ২০ শতাংশ বা তারও বেশি পর্যন্ত কমে যায়। এই অবস্থায় কিডনির অনেকটা ক্ষতি হয়ে গিয়ে থাকে। তৎক্ষণাৎ সঠিক চিকিৎসাতে কিডনির উপকার হতে পারে। কিন্তু আমাদের জানা দরকার যে, চিকিৎসা থেকে প্রাপ্ত লাভের সুযোগ অনেকটাই অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। যখন রক্তে ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা ৮.০ থেকে ১০.০ মি.গ্রা./ডেসিলিটার হয়, তার অর্থ কিডনি অনেকটা বেশিই খারাপ হয়ে গেছে। এই অবস্থায়, chronic renel failure চিকিৎসা বা ঔষধ পথ্যের দ্বারা ঠিক হবার সুযোগ আর থাকে না। অধিকাংশ রোগীর ক্ষেত্রেই এই সময়ে ডায়ালিসিসের দরকার হয়। Acute renal failure-এ ও ক্রিয়েটিনিন বাড়তে পারে, তখন ডায়ালিসিস এবং ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা দরকার।

ভুল ধারণা : একবার ডায়ালিসিস করালে বার বার ডায়ালিসিস করাতে হয়।

বাস্তব সত্য : না, অ্যাকিউট কিডনি ফেলিওরের রোগীদের ক্ষেত্রে কয়েকবার ডায়ালিসিস করানোর পরে, কিডনি পুনরায় ঠিকঠাক কাজ করতে শুরু করে এবং আর ডায়ালিসিস করানোর দরকার হয় না। ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে

ডায়ালিসিসে দেরি করলে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। ডায়ালিসিস দ্বারা কেবলমাত্র ক্রিয়েটিনিন, ইউরিয়া ইত্যাদি দূষিত পদার্থ পরিষ্কার করা হয়। কিডনি ফেলিওর ওষুধ বা অন্যান্য পদ্ধতিতে ঠিক করা যেতে পারে।
কিন্তু ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের অন্তিম পর্যায়ে, শরীর সুস্থ রাখার জন্য নিয়মিত ডায়ালিসিস অনিবার্য।
কতবার ডায়ালিসিস করানো দরকার তা কিডনি ফেলিওরের প্রকারের উপর নির্ভর করে।

ভুল ধারণা : কিডনি প্রতিস্থাপনের সময় স্ত্রী এবং পুরুষ একজন অন্যজনের কিডনি নিতে পারে না।

বাস্তব সত্য : না, প্রতিস্থাপনের সময় স্ত্রী ও পুরুষ একজন অন্যজনকে কিডনি দান করতে পারে।

ভুল ধারণা : কিডনি দান করলে শরীর এবং যৌনজীবনের উপর খারাপ প্রভাব পড়ে।

বাস্তব সত্য : না, একটি কিডনির সঙ্গে মানুষ সুস্থ স্বাভাবিকভাবে বাঁচতে পারে এবং শরীর বা যৌনজীবনের উপরে কোনও প্রভাব পড়ে না।

ভুল ধারণা : কিডনি প্রতিস্থাপনের জন্য কিডনি কেনা যেতে পারে।

বাস্তব সত্য : আইনত কিডনি কেনা বা বেচা দুটিই দণ্ডনীয় অপরাধ, যার জন্য জেল এবং জরিমানাও হতে পারে।

ভুল ধারণা : কিডনি কেবলমাত্র পুরুষদেরই থাকে এবং তা দুটি পায়ের সংযোগস্থলে অবস্থিত চামড়ার থলির মধ্যে থাকে।

বাস্তব সত্য : পুরুষ এবং স্ত্রীর ক্ষেত্রে কিডনির অবস্থান এবং আকার সমান হয়, যা পিঠের দিকে মেরুদণ্ডের দুইপাশে অবস্থিত। পুরুষদের দুটি পায়ের সংযোগস্থলে অবস্থিত থলির মধ্যস্থিত গোলাকার অঙ্গ দুটি হল শুক্রাশয় (টেসটিস), যা প্রজননের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

ভুল ধারণা : আমার রক্তচাপ এখন স্বাভাবিক, এইজন্য আমার ওষুধ খাবার দরকার নেই। অ ামার কোনও অসুবিধাও নেই, তো শুধু শুধু ওষুধ খাব কেন?

বাস্তব সত্য : উচ্চ রক্তচাপের কিছু রোগী রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে আসার পরে, ব্লাডপ্রেসারের ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দেন। কিছু রোগীর ক্ষেত্রে রক্তচাপ অধিক হওয়া সত্ত্বেও কোনও অসুবিধা হয় না, তখন তাঁরা ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে

দেন। এটা ভুল।

উচ্চ রক্তচাপ দীর্ঘদিন ধরে থাকলে মস্তিষ্ক এবং কিডনির উপর গভীর প্রভাব পড়ে। এই অবস্থাকে এড়ানোর জন্য কোনও অসুবিধা না থাকা সত্ত্বেও, সঠিকভাবে, সঠিকসময়ে এবং নিয়মিতরূপে চিকিৎসা করানো এবং ওষুধ খাওয়া দরকার যাতে প্রেসার সবসময় মাত্রার মধ্যে থাকে।

ভুল ধারণা : জল বেশি খেলে কিডনির রোগ সারে—

বাস্তব সত্য : প্রস্রাবে ইনফেকশান (Unrinary tract infection), Gout এর মত, পথের ইত্যাদি কিছু সম্মুখে তিন লিটার বা তারও বেশি জল পান করা যেতে পারে। কিডনি খারাপ হলে (রক্তে ক্রিয়েটিন বাড়লে) এবং সম্মুখ যদি নেফ্রাইটিস বা নেফ্রেটিক সিনড্রোম ইত্যাদি থেকে হয়ে থাকে তখন প্রস্রাব তৈরি করার ক্ষমতা কমে যায়। এই অবস্থায় জল পরিমাণমতো খেতে হয়। যতটা প্রস্রাব হচ্ছে এবং পা ফোলা আছে কিনা দেখে জল খাওয়ার পরিমাণ ঠিক করতে হয়। এই অবস্থায় বেশি জল খাওয়া বিপদজনক।

ভুল ধারণা : কিডনি প্রতিস্থাপনের পরে ওষুধ দু-একদিন না খেলেও চলে।

বাস্তব সত্য : ওষুধ একবেলাও বন্ধ করা উচিত নয়। ভুল করে একবেলা বন্ধ হলেও পরের সময় দুবেলার ওষুধ খাওয়ার দরকার। কিছুদিন বন্ধ করার পরে কিডনি নষ্ট হতে পারে।

ভুল ধারণা : খাদ্যতালিকা ঠিক রাখলে ক্রিয়েটিনিন আর বাড়বে না।

বাস্তব সত্য : খাদ্যতালিকা ঠিক রাখলে রক্তে পটাসিয়াম, সোডিয়াম এবং ফসফেট ইত্যাদি ঠিক রাখা যায়। কিডনি ৬০-৭০% খারাপ হওয়ার পরে সময়ের সাথে সাথে বাড়তেই থাকে। সুগার, প্রেসার, জল এবং খাদ্যতালিকা ঠিক রাখলে ক্রিয়েটিনিন বাড়ার গতি কমানো যায়, বন্ধ করা যায় না।

ভুল ধারণা : কিডনি প্রতিস্থাপন-এর পরমায়ু অনন্তকাল হবে।

বাস্তব সত্য : কিডনি প্রতিস্থাপন (সংস্থাপন) করার সময় অপারেশন গত জটিলতা, ইনফেকশান এবং রিজেকশান ইত্যাদি কারণে ২-৩% কিডনি খারাপ হতে পারে এবং ১% রোগীর মৃত্যুও হতে পারে। প্রথম একবছর বিশেষ করে প্রথম তিনমাস বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন জরুরি। একবছর পরে কিডনির রিজেকশান কমে আসে এবং রোগী মৃত্যু অন্যান্য কারণ যেমন স্ট্রোক, হার্ট এটাক, নিউমোনিয়া, ইনফেকশান ইত্যাদি থেকেই হতে পারে। প্রতিস্থাপিত রোগীর গড়

পরমায়ু সাধারণ মানুষের থেকে কম অথচ ডায়ালিসিস রোগীর থেকে অনেক বেশি।

ভুল ধারণা : ডায়ালিসিস রোগীর পরমায়ু বহুদিন বাঁচবেন।

বাস্তব সত্য : ডায়ালিসিস রোগীর পরমায়ু অনেক Cancer রোগীর থেকেও কম। ডায়ালিসিস রোগীরা সাধারণত স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক, নিউমোনিয়া, উচ্চ পটাসিয়াম, কম ডায়ালিসিস (Under dialysis), অন্য ইনফেকশন ইত্যাদি কারণে মারা যান। পর্যাপ্ত (৩-৪/week) ডায়ালিসিস এবং জল (Ultrapure water) দিয়ে ডায়ালিসিস করলে পরমায়ু কিছুটা বাড়ে।

অধ্যায় ৭.
কিডনির সুরক্ষার উপায়

কিডনির বেশ কিছু রোগ খুব গম্ভীর হয়। আর এই রোগের সময়ে চিকিৎসা না হলে ক্ষতিকর হতে পারে। ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের মতো রোগ পুনরায় পুরোপুরি ঠিক হয় না। এবং অন্তিম পর্যায়ে যার চিকিৎসা, যেমন ডায়ালিসিস আর কিডনির প্রতিস্থাপন খুবই ব্যয়বহুল। এইসব সুবিধা সব জায়গাতে পাওয়া যায় না। এই কারণে, 'Prevention is Better Than Cure' এই প্রবাদবাক্যের অনুসরণ করা দরকার। কিডনিকে খারাপ হবার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সবার জানা দরকার।

এটি নিম্নলিখিত দুই ভাগে বিভক্ত —

- স্বাভাবিক ব্যক্তির জন্য তথ্য
- কিডনি রোগীদের সেবাসুশ্রূষার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য

স্বাভাবিক ব্যক্তির জন্য তথ্য

১. কিডনিকে স্বাস্থ্যবান রাখার জন্য সাধারণ সূচনা :

- রোজ 3 লিটারের বেশি (১০-১২ গ্লাস) জল পান করা দরকার (যাদের শরীরে ফোলাভাব দেখা যায় না)।
- নিয়মিত শরীরচর্চা এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা।
- 40 বছরের বেশি বয়স্কদের খাবারে নুনের মাত্রা কম করা।
- ধূমপান, তামাক, গুটকা, মদ্যপান না করা।
- ডাক্তারবাবুর পরামর্শ ছাড়া অনাবশ্যক ওষুধ না খাওয়া।

২. পরিবারে ডায়াবিটিস, উচ্চ রক্তচাপের এবং পলিসিসটিক কিডনির রোগী থাকলে প্রয়োজনীয় সূচনা :

ডায়াবিটিস এবং উচ্চ রক্তচাপের রোগ বংশানুক্রমিক। যদি পরিবারে এই রোগ থেকে থাকে তাহলে পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের কুড়ি বছর বয়সের পর থেকে বছরে একবার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখে নেওয়া দরকার যে এই দুটি রোগের উপস্থিতি আছে কি না।

৩. নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা :

৪০ বছর বয়সের পর থেকে, শরীরে কোনও অসুবিধা না থাকা সত্ত্বেও, পরীক্ষা করালে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবিটিস, মূত্র, ক্রিয়েটিনিন এবং ইউরিক অ্যাসিড ইত্যাদি কিডনির অনেক রোগ সংক্রান্ত লক্ষণ জানতে পারা যায়।

কিডনির রোগ হবার পর প্রয়োজনীয় সাবধানতা

১. কিডনি রোগের তথ্য এবং প্রাথমিক নির্ণয় :

মুখমণ্ডল আর পায়ে ফোলাভাব, খাবারে অরুচি, বমিভাব, রক্ত ফ্যাকাসে হওয়া, দীর্ঘ সময় ধরে দুর্বলতা, রাত্রে অনেক বার প্রস্রাব করতে ওঠা, প্রস্রাব করতে অসুবিধা হওয়ার মতো লক্ষণ কিডনি রোগের সংকেত হতে পারে।

এইসব অসুবিধায় পীড়িত ব্যক্তির যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ডাক্তারের কাছে যাওয়া দরকার। উপরোক্ত লক্ষণের অনুপস্থিতিতে, যদি প্রস্রাবে প্রোটিন লক্ষ করা যায়, বা রক্তে ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা বেড়ে যায়, তাহলেও কিডনির রোগ হয়ে থাকতে পারে। কিডনি রোগ প্রাথমিক অবস্থাতে নির্ণয়, রোগের প্রতিরক্ষা, নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিকারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২. ডায়াবিটিসের রোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় সাবধানতা :

ডায়ালিসিসে আসার রোগীদের প্রত্যেক তিনজনের মধ্যে একজনের কিডনি পুরোপুরি বিকল হবার কারণ হল ডায়াবিটিস।

এই গভীর সমস্যাকে প্রতিরোধ করার জন্য ডায়াবিটিসের রোগীদের সর্বদা ওষুধ এবং চিকিৎসার দ্বারা ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা দরকার।

প্রত্যেক রোগীর কিডনির উপর ডায়াবিটিসের প্রভাব তাড়াতাড়ি জানার জন্য প্রতি তিন মাসে একবার রক্তচাপ এবং প্রস্রাবে প্রোটিনের মাত্রা পরীক্ষা করানো দরকার। রক্তচাপের বৃদ্ধি, প্রস্রাবে প্রোটিনের উপস্থিতি, শরীরে ফোলাভাব, রক্তে বারবার শর্করার (গ্লুকোজ) মাত্রা কমে যাওয়া বা ডায়াবিটিসের জন্য প্রয়োজনীয় ইনসুলিনের মাত্রা কমে যাওয়া ইত্যাদি কারণে কিডনি খারাপ হবার সম্ভাবনা। যদি রোগীকে ডায়াবিটিসের কারণে উদ্ভুত চোখের সমস্যার জন্য লেজার চিকিৎসা করানো হয়ে থাকে, তাহলে এইসব রোগীর ক্ষেত্রে কিডনি খারাপ হবার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে। কিডনিকে খারাপ হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য, ডায়াবিটিসের কারণে কিডনির প্রাথমিক চিকিৎসা দরকার। এজন্য প্রস্রাবের মাইক্রোঅ্যালবুমিন, ক্রিয়েটিনিন পরীক্ষাই হল একমাত্র এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পরীক্ষা।

৩. উচ্চ রক্তচাপ রোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় সাবধানতা :

উচ্চ রক্তচাপ ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। অধিকাংশ

রোগীদের ক্ষেত্রে রক্তচাপের কোনও লক্ষণ না থাকার কারণে, রোগী ব্লাড প্রেসারের ওষুধ অনিয়মিত ভাবে খায় বা বন্ধ করে দেয়। এইসব রোগীদের উচ্চ রক্তচাপ দীর্ঘ সময় ধরে বজায় থাকার ফলে কিডনি ফেল হবার আশঙ্কা থাকে। সেজন্য উচ্চ রক্তচাপ রোগীদের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা খুবই দরকার। আর কিডনির উপর এর প্রভাবের শীঘ্র নির্ণয়ের জন্য বছরে একবার প্রস্রাবের এবং রক্তের ক্রিয়েটিনিনের পরীক্ষা করানোর পরামর্শ দেওয়া হয়।

৪. ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের রোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় সাবধানতা :
যদি কিডনি ফেলিওরের রোগী কঠোরভাবে খাদ্যপানীয় নিয়ন্ত্রণ, নিয়মিত চিকিৎসা এবং ঔষধ সেবন করেন তাহলে কিডনি বিকল হবার প্রক্রিয়াকে মন্থর করা সম্ভব এবং ডায়ালিসিস বা কিডনি প্রতিস্থাপনের মতো চিকিৎসাকে এড়ানো সম্ভব।
ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের রোগীর কিডনিকে ক্ষতির থেকে বাঁচানোর জন্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল উচ্চ রক্তচাপের উপর সর্বদা এবং পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ। এই জন্য রোগীর বাড়িতেই দুই থেকে তিনবার বি. পি. মেপে চার্ট বানানো দরকার। তাহলে ডাক্তারবাবু এই চার্ট দেখে ঔষধের রদবদল করতে পারবেন। রক্তচাপ সর্বদা ১৪০/৮৪ এবং এর নীচে লাভদায়ক এবং আবশ্যক। ১৩০-৭০-এর কম থাকলে আরো ভালো।
ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের রোগীদের ক্ষেত্রে মূত্রমার্গে বাধা, পাথর প্রস্রাবে অসুবিধা বা অন্য সংক্রমণ, শরীরে জলের মাত্রা কম বা বেশি হওয়া (Dehydration) ইত্যাদির যথাসময়ে তৎপরতার সঙ্গে চিকিৎসা করালে কিডনির কার্যক্ষমতা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ঠিক রাখা সম্ভব।

৫. বংশানুক্রমিক রোগ পি. কে. ডি'র শীর্ষ নির্ণয় ও চিকিৎসা :
পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ (পি. কে. ডি) একটি বংশানুক্রমিক রোগ। সেজন্য পরিবারে কোনও একজনের এই রোগ হলে পরিবারের বাকি সদস্যদের একবার পরীক্ষা করে এই রোগের অস্তিত্ব তাদের শরীরে যাচাই করে নেওয়া দরকার।

৬. বয়স্কদের প্রস্রাবে বার বার সংক্রমণের উচিত চিকিৎসা :
যে কোনও বয়সে, যদি প্রস্রাব বার বার হয় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আসে, তাহলে এর কারণ জানা দরকার। এর কারণ মূত্রমার্গে বাধা, পাথর ইত্যাদি হলে উচিত সময়ে চিকিৎসার দ্বারা কিডনিকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব।

৭. পাথর এবং বি. পি. এইচ. এর সঠিক চিকিৎসা :
বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিডনি অথবা মূত্রমার্গে পাথরের নির্ণয় হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ

কিছু অসুবিধা হবার কারণে রোগীর চিকিৎসার প্রতি অবহেলা হয়ে থাকে। একইভাবে, বয়সকালে প্রস্টেটের অসুবিধার (বি. পি. এইচ) কারণে উৎপন্ন লক্ষণের প্রতিও অবহেলা করে থাকে। এইসব রোগীদের ক্ষেত্রে দীর্ঘসময় পরে কিডনির ক্ষতি হবার ভয় থাকে। এইজন্য সময় থাকতে ডাক্তারবাবুর পরামর্শমতো চিকিৎসা শুরু করা দরকার।

৮. কম বয়সে উচ্চ রক্তচাপের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা :

সাধারণ 30 বছরের কমবয়স্ক ব্যক্তিদের উচ্চরক্তচাপ অস্বাভাবিক। কম বয়সে উচ্চরক্তচাপের অন্যতম প্রধান কারণ হল কিডনির রোগ। এইজন্য কম বয়সে উচ্চ রক্তচাপ হলে কিডনির পরীক্ষা অবশ্যই করানো দরকার।

৯. অ্যাকিউট কিডনি ফেলিওরের শীঘ্র চিকিৎসা :

হঠাৎ কিডনি খারাপ হবার কারণগুলি হল, ডাইরিয়া, বমি, ম্যালেরিয়া, অত্যধিক রক্তস্রাব, রক্তের মারাত্মক সংক্রমণ, মূত্রমার্গে অবরোধ ইত্যাদি। এই সব সমস্যাগুলির শীঘ্র, উচিত এবং সম্পূর্ণ চিকিৎসার মাধ্যমে কিডনিকে খারাপ হবার হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব।

১০. ডাক্তারবাবুর পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধসেবন :

সাধারণত দীর্ঘ সময় ধরে যে ঔষধগুলি সেবন করা হয় (যেমন যন্ত্রণা কমানোর ঔষধ) সেগুলি দীর্ঘদিন খেলে কিডনি খারাপ হবার সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য অনাবশ্যক ওষুধ খাওয়ার প্রবৃত্তিকে এড়ানো দরকার, এবং অনাবশ্যক ঔষধাবলি ডাক্তারবাবুর পরামর্শ মতো নির্ধারিত মাত্রা এবং সময়েই নেওয়া লাভজনক। সমস্ত আর্য়ুবেদিক ওষুধই ভাল এবং উপকারী—এটি একটি ভুল ধারণা। বেশ কিছু ভারী ধাতুর ভস্ম কিডনির জন্য খুবই ক্ষতিকারক।

১১. একটি কিডনিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজনীয় সাবধানতা :

এক কিডনিযুক্ত ব্যক্তিদের অধিক জল খাওয়া, প্রস্রাবের অন্যান্য সংক্রমণের শীঘ্র এবং উচিত চিকিৎসা করানো এবং নিয়মিত রূপে ডাক্তার দেখানো খুবই জরুরি।

বিভাগ—২

কিডনির প্রধান প্রধান রোগ এবং চিকিৎসা :

- কিডনি ফেলিওরের নির্ণয়, প্রতিরোধের উপায় এবং চিকিৎসা
- ডায়ালিসিস সম্বন্ধে সরল তথ্যাবলি
- কিডনি প্রতিস্থাপন, ক্যাডাভার প্রতিস্থাপন সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সূচনাবলি
- কিডনির প্রধান রোগসমূহের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি
- কিডনি ফেলিওরের রোগীদের খাদ্যপানীয় সূচি এবং সাবধানতা।

অধ্যায় ৮.
কিডনি ফেলিওর কী?

শরীরে কিডনির প্রধান কাজ হল রক্তের পরিশোধন করা। যখন অসুখের কারণে কিডনিযুগল তার স্বাভাবিক কাজ করতে পারে না এবং কিডনির কর্মক্ষমতা কম হয়ে যায়, এই অবস্থাকেই কিডনি ফেলিওর বলে।

কিডনি ফেলিওরের নির্ণয় কীভাবে করা হয়?

রক্তে ক্রিয়েটিনিন এবং ইউরিয়ার মাত্রার পরীক্ষার দ্বারা কিডনির কার্যক্ষমতা জানা যায়। সাধারণত কিডনির কার্যক্ষমতা শরীরের প্রয়োজনের থেকে বেশি হয়। সেজন্য কিডনির অল্প স্বল্প ক্ষতি হলেও, রক্তের পরিশোধনের কোনও ত্রুটি দেখা যায় না। কিন্তু যখন দুটি কিডনিরই কার্যক্ষমতা ৬০ শতাংশেরও বেশি কমে যায় তখন রক্তে, ক্রিয়েটিনিন এবং ইউরিয়ার মাত্রা সাধারণের থেকে বেশি মাত্রায় পাওয়া যায়।

একটিমাত্র কিডনি খারাপ হলে কি কিডনি ফেলিওর হতে পারে?

না, যদি কোনও মানুষের দুটি সুস্থ কিডনির মধ্যে একটি খারাপ হয়ে যায় বা শরীর থেকে কোনও কারণে কেটে বাদ দেওয়া হয় তাহলে দ্বিতীয় সুস্থ কিডনি নিজের কর্মক্ষমতার বৃদ্ধির দ্বারা শরীরের রক্ত পরিবেশন এবং অন্যান্য কাজ সম্পূর্ণরূপে করতে পারে।

কিডনি ফেলিওরের প্রধান দুটি প্রকার হল :

অ্যাকিউট কিডনি ফেলিওর আর ক্রনিক কিডনি ফেলিওর, এই দুই প্রকার কিডনি ফেলিওরের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্টরূপে জানা দরকার।

অ্যাকিউট কিডনি ফেলিওর

অ্যাকিউট কিডনি ফেলিওরের ক্ষেত্রে, স্বাভাবিক কার্যরত কিডনি বিভিন্ন রোগের কারণে ক্ষতির ফলে হঠাৎ করে কাজ কম বা বন্ধ করে দেয়।

যদি এই রোগের তাড়াতাড়ি সঠিক চিকিৎসা করা যায়, তাহলে অল্প সময়ের মধ্যেই কিডনি পুনরায় সম্পূর্ণরূপে কাজ করতে শুরু করে এবং পরে রোগীর ওষুধ বা চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না।

দুটি কিডনি খারাপ হবার পরেই কিডনি ফেলিওর হয়

অ্যাকিউট কিডনি ফেলিওরের সমস্ত রোগীর চিকিৎসা ঔষধপথ্যের দ্বারা করা হয়। কিছু রোগীর ক্ষেত্রে অল্প সময়ের জন্য ডায়ালিসিসের দরকার হয়।

ক্রনিক কিডনি ফেলিওর

ক্রনিক কিডনি ডিজিজ (CKD) এর ক্ষেত্রে অনেক প্রকার রোগের কারণে, কিডনির কার্যক্ষমতা ক্রমশ বেশ কয়েক মাস বা বছর ধরে ধীরে ধীরে কম হতে থাকে বা শেষ হয়ে যায়। বর্তমান চিকিৎসা পদ্ধতিতে ক্রনিক কিডনি ফেলিওরকে ঠিক বা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করার কোনও ওষুধ নেই।

ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের সমস্ত রোগীর চিকিৎসা ওষুধ, পথ্য এবং নিয়মিত পরীক্ষার দ্বারা করা হয়ে থাকে। শুরুতে চিকিৎসার লক্ষ হল ক্ষতিগ্রস্ত কিডনির কার্যক্ষমতা বজায় রাখা, কিডনি ফেলিওরের লক্ষণগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা, এবং ভবিষ্যতে ক্ষতির থেকে বাঁচানো। এই চিকিৎসার আরও একটি উদ্দেশ্য হল, রোগীর স্বাস্থ্যকে সন্তোষজনক রেখে, ডায়ালিসিস-এ আসার অবস্থাকে যথাসম্ভব দূরে ঠেলা। কিডনি অধিক খারাপ হলে, সঠিক চিকিৎসার পরেও রোগের লক্ষণ বাড়তে থাকে এবং রক্তে ক্রিয়েটিনিন এবং ইউরিয়ার মাত্রা অধিক বেড়ে যায়, এইরকম রোগীদের ক্ষেত্রে একমাত্র বিকল্প ডায়ালিসিস এবং কিডনি প্রতিস্থাপন। প্রসাবে প্রোটিনের বেশি মাত্রা, অতিরিক্ত ইউরিক আসিড, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ, ফসফেট এর মাত্র নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি দ্বারা ক্রনিক কিডনি ফেলিওর নিয়ন্ত্রণ হয়।

যখন কিডনিযুগল ৬০ শতাংশের অধিক খারাপ হয়ে থাকে তখনই কিডনি ফেলিওরের নির্ণয় সম্ভব।

অধ্যায় ৯.
অ্যাকিউট কিডনি ফেলিওর

অ্যাকিউট কিডনি ফেলিওর কী?

সম্পূর্ণরূপে সাধারণ কর্মক্ষম কিডনি কোনও কারণে হঠাৎ করে ক্ষতিগ্রস্ত হবার ফলে অল্প সময়ের জন্য কাজ বন্ধ করে দেয়, এমত অবস্থাকে অ্যাকিউট কিডনি ফেলিওর বলে।

অ্যাকিউট কিডনি ফেলিওর হবার কারণ কী?

অ্যাকিউট কিডনি ফেলিওর হবার কারণগুলি হল :

১. অত্যধিক বমি, পায়খানা হবার ফলে শরীরে জলের মাত্রা কমে যাওয়া এবং রক্তচাপ কমে যাওয়া।
২. ফ্যালসিফেরাম ম্যালেরিয়া, লেপ্টোস্পাইরোসিস।
৩. G6PD Deficiency হওয়া। এই রোগে রক্তের রক্তকণিকা কিছু ওষুধ ব্যবহারের ফলে ভঙ্গুর হয়ে যায়, এবং হঠাৎ কিডনি ফেলিওর হয়ে যায়।
৪. পাথরের কারণে মূত্রমার্গে বাধা সৃষ্টি।

এছাড়া রক্তে গভীর সংক্রমণ (Septicemia), কিডনির গভীর সংক্রমণ, কিডনির বিশেষ প্রকার রোগ (Glomerulonepritis) মহিলাদের প্রসবের সময় অত্যধিক রক্তচাপ বা অত্যধিক রক্তক্ষয়, ঔষধের খারাপ বা বিপরীত প্রভাব, সর্পদংশন, অত্যধিক স্নায়ুচাপের ফলে উৎপন্ন বিষাক্ত পদার্থের কিডনির উপর খারাপ প্রভাব ইত্যাদি হল অ্যাকিউট কিডনি ফেলিওরের মুখ্য কারণ।

অ্যাকিউট কিডনি ফেলিওরের লক্ষণ

এই ধরনের কিডনি ফেলিওরে, সম্পূর্ণরূপে কার্যরত কিডনি হঠাৎ করে খারাপ হবার কারণে লক্ষণ খুবই অধিক মাত্রায় প্রকট হয়। এই লক্ষণগুলি রোগীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাত্রায় প্রকাশ পায়।

অ্যাকিউট কিডনি ফেলিওরে দুটি কিডনি হঠাৎ করে খারাপ হয় বলে, লক্ষণ অধিক মাত্রায় দেখা যায়।

অ্যাকিউট কিডনি ফেলিওরের লক্ষণগুলি হল নিম্নরূপ :

- ক্ষুধামান্দ্য, অস্বস্তি, বমিভাব, হেঁচকি।
- প্রস্রাব কমে যাওয়া বা বন্ধ হয়ে যাওয়া।
- মুখমণ্ডল বা শরীরে ফোলাভাব, শ্বাসকষ্ট, রক্তচাপ বৃদ্ধি।
- শারীরিক দুর্বলতা, অনিদ্রা, স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়া, ইত্যাদি।
- রক্তবমি এবং রক্তে পটাশিয়ামের মাত্রাবৃদ্ধি (যার কারণে হৃৎপিণ্ড হঠাৎ বন্ধ হতে পারে)

কিডনি ফেলিওরের লক্ষণ ছাড়াও যে কারণে কিডনি খারাপ হয়েছে সেই রোগের লক্ষণও রোগীদের মধ্যে দেখা যায় যেমন, বিষাক্ত ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর।

অ্যাকিউট কিডনি ফেলিওরের নির্ণয়

যখন কোনও রোগের কারণে কিডনি ফেলিওর হবার আশঙ্কা হয়, বা রোগীর শারীরিক লক্ষণ দেখে কিডনি ফেলিওরের আশঙ্কা হয়, তাহলে তৎক্ষণাৎ রক্ত পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া দরকার। রক্তে ক্রিয়েটিনিন আর ইউরিয়ার বর্ধিত মাত্রা কিডনি ফেলিওরের সংকেত দেয়। প্রস্রাব এবং রক্ত পরীক্ষা সোনোগ্রাফি ইত্যাদির দ্বারা অ্যাকিউট কিডনি ফেলিওরের নির্ণয়, তার কারণ নির্ণয় এবং অ্যাকিউট কিডনি ফেলিওরের কারণে উদ্ভূত অন্যান্য খারাপ প্রভাবের লক্ষণও জানা যায়।

অ্যাকিউট কিডনি ফেলিওর প্রতিরোধের উপায়

বমি, পায়খানা, ম্যালেরিয়ার মতো কিডনি খারাপ হওয়ার রোগের শীঘ্র নির্ণয় এবং চিকিৎসার দ্বারা অ্যাকিউট ফেলিওর প্রতিরোধ করা সম্ভব।

এই রোগের দ্বারা পীড়িত রোগীদের—

- রোগের শুরুতে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল খাওয়া উচিত।
- পরে যদি প্রস্রাব কম হয় তাহলে শীঘ্র ডাক্তারবাবুকে জানানো দরকার, আর প্রস্রাবের মাত্রার সমান জল খাওয়া দরকার।
- কিডনি-ক্ষতিকারক কোনও ওষুধ খাওয়া উচিত নয়। (বিশেষভাবে যন্ত্রণানাশক ওষুধ)

অ্যাকিউট কিডনি ফেলিওরে কিডনি কত সময় পরে পুনরায় কাজ করে?

যোগ্য চিকিৎসা শুরুর মাত্র ১ থেকে ১২ সপ্তাহের মধ্যেই অধিকাংশ রোগীদের

অ্যাকিউট কিডনি ফেলিওরে দুটি কিডনির কার্যক্ষমতা অল্প সময়ের মধ্যে অল্প দিনের জন্য কমে যায়

কিডনি পুরোপুরি কাজ করতে শুরু করে। এইসব রোগীদের চিকিৎসা পুরো হবার পরে ওষুধ খাবার বা ডায়ালিসিস করানোর দরকার হয় না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে রোগ অল্প সারতে পারে বা একদম নাও সারতে পারে। তিন মাস পরে না সারলে তা ক্রনিক কিডনি ফেলিওর হয়ে যায়।

অ্যাকিউট কিডনি ফেলিওরের চিকিৎসা

এই রোগের চিকিৎসা রোগের কারণ, লক্ষণ আর ল্যাবরেটরি পরীক্ষার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন রোগীদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়। শীঘ্র গভীর চিকিৎসার দ্বারা রোগী যেমন পুনর্জন্ম পেতে পারে, ঠিক তেমনি বিনা চিকিৎসার ফলে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

অ্যাকিউট কিডনি ফেলিওরের মুখ্য চিকিৎসাগুলি হল :

১. কিডনি খারাপ হওয়ার কারণের চিকিৎসা।
২. খাদ্য-পানীয়র নিয়ন্ত্রণ।
৩. ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা।
৪. ডায়ালিসিস।

১. কিডনি খারাপ হওয়ার কারণের চিকিৎসা :

- কিডনি ফেলিওরের মুখ্য কারণের মধ্যে বমি, পায়খানা বা ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়া হতে পারে, যেগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সঠিক চিকিৎসা করানো দরকার। রক্তের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিশেষ অ্যান্টিবায়োটিক্স দ্বারা চিকিৎসা করা হয়। রক্তকণা ক্ষয় হলে রক্ত দেওয়া দরকার।
- পাথরের কারণে মূত্রমার্গে অবরোধ হয়ে থাকলে, দূরবিন দ্বারা বা অপারেশন দ্বারা চিকিৎসা করা যায়।
- শীঘ্র এবং সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে কিডনিকে বেশি খারাপ হবার হাত থেকে বাঁচানো যায় এবং এর ফলে কিডনি পুনরায় সম্পূর্ণরূপে কাজ করতে শুরু করে।
- কোনো কোনো কারণে অ্যাকিউট রেনাল ফেলিওর চিকিৎসা পরে সম্পূর্ণ নিরাময় হয় না। তখন ক্রনিক রেনাল ফেলিওর হয়ে যায়। সাধারণত তিনমাস পরে এই অবস্থা বোঝা যায়।

২. খাদ্য পানীয়র নিয়ন্ত্রণ :

এই রোগের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত কিডনি, সঠিক চিকিৎসার পরে ঠিক হয়ে পুনরায় কাজ করতে থাকে

- কিডনি কাজ না করার কারণে উদ্ভূত অসুবিধা বা জটিলতাকে কম করার জন্য খাদ্য পানীয়ের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।
- প্রস্রাবের মাত্রার উপর নির্ভর করে জল এবং অন্যান্য পানীয়ের পরিমাণ কম করা দরকার, যার দ্বারা শরীরের ফোলাভাব এবং শ্বাস প্রশ্বাসের অসুবিধা থেকে উপশম পাওয়া যায়।
- রক্তে পটাশিয়ামের মাত্রা যাতে না বাড়ে সেজন্য ফলের রস, ডাবের জল ইত্যাদি খাওয়া উচিত নয়। যদি রক্তে পটাশিয়ামের মাত্রা বেড়ে যায় তাহলে তা হৃদয়ের উপর ক্ষতিকারক।
- লবণের মাত্রার নিয়ন্ত্রণ ফোলাভাব, উচ্চ রক্তচাপ, শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট, অত্যধিক তৃষ্ণা ইত্যাদিকে কম করে।

৩. ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা :

- প্রস্রাব বাড়ানোর ওষুধ : প্রস্রাব কম হবার কারণে শরীরে উদ্ভূত ফোলাভাব, শ্বাস-প্রশ্বাস কষ্ট, ইত্যাদি সমস্যাকে প্রতিরোধ করার জন্য খুবই উপযোগী।
- বমি ও অ্যাসিডিটির ওষুধ : কিডনি ফেলিওরের কারণে উদ্ভূত বমিভাব, শারীরিক অস্বস্তি, হেঁচকি আসা ইত্যাদিকে প্রতিরোধ করতে এই সব ওষুধ দেওয়া হয়।
- অন্যান্য ওষুধ, শ্বাসকষ্ট, রক্তবমি, শরীরে মোচড় আসা ইত্যাদি গভীর সমস্যা থেকে উপশম দেয়।

৪. ডায়ালিসিস :

ডায়ালিসিস কী?

কিডনি কাজ না করার কারণে শরীরে জমা অনাবশ্যক পদার্থ, জল, ক্ষার এবং অম্লর মতো রাসায়নিকের উপস্থিতি কৃত্রিম পদ্ধতিতে দূর করে রক্তের পরিশোধন করার প্রক্রিয়াকে ডায়ালিসিস বলে।

ডায়ালিসিস দুই প্রকার—পেরিটোনিয়াল এবং হিমোডায়ালিসিস সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ১৩ নং অধ্যায়ে করা হয়েছে।

ডায়ালিসিসের দরকার কখন পড়ে?

অ্যাকিউট কিডনি ফেলিওরের সমস্ত রোগীর চিকিৎসা ওষুধ এবং খাদ্য পানীয়র নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে করা হয়। কিন্তু যখন কিডনির বেশি ক্ষতি হয়ে গিয়ে থাকে

এই রোগে সঠিক ওষুধ দ্বারা শীঘ্র চিকিৎসার মাধ্যমে বিনা ডায়ালিসিসে কিডনি ঠিক হতে পারে।

তখন সমস্ত চিকিৎসা সত্ত্বেও রোগের লক্ষণ বাড়তে থাকে, এবং যার ফলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। এইরকম রোগীদের জন্য ডায়ালিসিস দরকার হয়। সঠিক সময়ে ডায়ালিসিসের দ্বারা রোগী নতুন জীবন পেতে পারে।

♦ **ডায়ালিসিস কতবার করাতে হয়?**

- যতক্ষণ পর্যন্ত রোগীর খারাপ হয়ে যাওয়া কিডনি পুনরায় সন্তোষজনকভাবে কাজ করতে শুরু না করে, ততক্ষণ ডায়ালিসিস কৃত্রিম রূপে কিডনির শরীর সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।
- কিডনি ঠিক হতে সাধারণত ১ থেকে ১২ সপ্তাহ সময় লাগে। এই সময়ে প্রয়োজন অনুসারে ডায়ালিসিস করানো দরকার।
- কিছু মানুষের মধ্যে ভুল ধারণা আছে যে, একবার ডায়ালিসিস করালে বার বার ডায়ালিসিস করাতে হয়। কখনো কখনো এই ভয়ে, রোগী চিকিৎসা করাতে দেরি করে ফেলে, যার ফলে রোগ খুবই বেড়ে যায়, আর ডাক্তারের চিকিৎসার আগেই রোগী মারা যায়।
- সমস্ত রোগীদের ক্ষেত্রেই ওষুধ এবং কিছু রোগীর ক্ষেত্রে ডায়ালিসিসের দ্বারা চিকিৎসার মাধ্যমে কয়েকদিনের (বা কয়েক সপ্তাহের) মধ্যেই কিডনি সম্পূর্ণরূপে কাজ করতে শুরু করে। পরে এইসব রোগী সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে যায় এবং কোনও ওষুধ বা চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না।

অ্যাকিউট কিডনি ফেলিওরে ডায়ালিসিসের প্রয়োজন কেবলমাত্র কয়েকদিনের জন্যই।

অধ্যায় ১০.

ক্রনিক কিডনি ডিজিজ - কারণ

কিডনির রোগের মধ্যে ক্রনিক কিডনি ফেলিওর (ক্রনিক কিডনি ডিজিজ CKD) খুবই হানিকারক রোগ কারণ বর্তমান চিকিৎসাবিজ্ঞানে এই রোগকে শেষ করার কোনও ওষুধ নেই। বিগত কয়েক বছরে এই রোগীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ডায়াবিটিস, উচ্চ রক্তচাপ, পাথর ইত্যাদি রোগীর বর্ধিত সংখ্যা এর জন্য মুখ্যরূপে দায়ী।

ক্রনিক কিডনি ফেলিওর কী?

এই প্রকারের কিডনি ফেলিওরে, কিডনি খারাপ হবার প্রক্রিয়া খুবই মন্থর হয়, যা কয়েকমাস বা বছর ধরে চলতে থাকে। দীর্ঘ সময় পরে, কিডনিযুগল একদম সংকুচিত হয়ে ছোট হয়ে যায় এবং কাজ করা বন্ধ করে দেয়, যা কোনও ওষুধ, অপারেশন বা ডায়ালিসিস দ্বারা ঠিক করা যায় না।

ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের রোগীদের প্রাথমিক চিকিৎসা করা উচিত ওষুধ এবং খাদ্য পানীয়র নিয়ন্ত্রণ দ্বারা।

এন্ড স্টেজ কিডনি (রেনাল) ডিজিজ (ESKD or ESRD) কী?

ক্রনিক কিডনি ফেলিওর রোগীদের কিডনিযুগল ধীরে ধীরে খারাপ হতে থাকে। যখন কিডনি ৭০ শতাংশ বা তার বেশি খারাপ হয়ে যায় বা পুরোপুরি কাজ করা বন্ধ করে দেয়, তখন সেই অবস্থাকে এন্ড স্টেজ রেনাল ডিজিজ বা সম্পূর্ণ কিডনি ফেলিওর বলে।

এই অবস্থায় সঠিক ওষুধ পথ্য খাবার পরেও রোগীর স্বাস্থ্য খারাপ হতে থাকে, এবং সেই অবস্থা থেকে বাঁচবার জন্য সর্বদা নিয়মিত রূপে ডায়ালিসিস করানো দরকার বা কিডনি প্রতিস্থাপন করানোর দরকার হতে পারে।

ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের মুখ্য কারণ কী?

ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের মুখ্য কারণগুলি হল নিম্নরূপ—

১. ডায়াবিটিস : এটা খুবই দুঃখের যে শতকরা ৩০-৪০ শতাংশ ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের রোগীর বা প্রতি তিনজন ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের রোগীর

> **ক্রনিক কিডনি ফেলিওরে কিডনি ধীরে ধীরে খারাপ হতে থাকে এবং পুনরায় ঠিক হয় না।**

একজনের কিডনি ডায়াবিটিস-এর কারণে খারাপ হয়ে থাকে। ডায়াবিটিস, ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং গম্ভীর কারণ। এই কারণে প্রত্যেক ডায়াবিটিসের রোগীর এই রোগের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

২. উচ্চ রক্তচাপ :

দীর্ঘ সময় ধরে যদি উচ্চ রক্তচাপ থাকে, তাহলে তা ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের কারণ হতে পারে।

৩. ক্রনিক গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস :

এই প্রকারের কিডনির রোগে মুখে বা হাতে ফোলাভাব দেখা যায় আর কিডনিযুগল ধীরে ধীরে কাজ করা বন্ধ করে দেয়।

৪. বংশানুক্রমিক রোগ :

পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ।

৫. পাথর রোগ :

কিডনি আর মূত্রমার্গের দুই অংশে পাথরের অবরোধের কারণের ঠিক সময়ে চিকিৎসা না হওয়া।

৬. দীর্ঘদিন ধরে ওষুধ খাওয়া (যন্ত্রণানাশক ওষুধ, ছাইভস্ম ইত্যাদি) যেগুলি কিডনির পক্ষে হানিকারক।

৭. শিশুদের কিডনি এবং মূত্রমার্গে বারবার সংক্রমণ।

৮. শিশুদের জন্মগত রোগ বা অবরোধ (Vesico Ureteric Reflux, Posterior Urethral Valve) ইত্যাদি।

ডায়াবিটিস এবং রক্তচাপ ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কারণ

অধ্যায় ১১.
ক্রনিক কিডনি ডিজিজ - লক্ষণ এবং নির্ণয়

ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের (CKD) কিডনির পুরোপুরি খারাপ হতে কয়েকমাস থেকে কয়েক বছর সময় লাগে। শুরুতে কিডনিযুগলের কার্যক্ষমতা বেশি থাকার জন্য কোনও লক্ষণ প্রকাশ পায় না। কিন্তু যখন কিডনি অত্যধিক খারাপ হয়ে যায় তখন রোগীর কষ্ট বা যন্ত্রণা বেড়ে যায়। রোগের লক্ষণ এবং কিডনির কার্যক্ষমতার উপর নির্ভর করে কিডনির অবস্থাকে তিনটি আলাদা আলাদাভাবে ভাগ করা যায়—প্রাথমিক, মধ্যম, অন্তিম।

প্রাথমিক অবস্থায় প্রকাশিত লক্ষণ

ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের শুরুতে যখন কিডনির কর্মক্ষমতা ৩৫ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত কমে যায় তখন রোগীদের কোনও অসুবিধা হয় না।

হঠাৎ নির্ণয়

এই অবস্থায় অন্য রোগের নির্ণয়ের সময় বা মেডিক্যাল চেকআপের সময় আকস্মিকভাবে অধিকাংশ রোগীদের ক্ষেত্রে এই রোগের নির্ণয় হয়। এই সময়ে রক্তে ক্রিয়েটিনিন এবং ইউরিয়ার পরীক্ষাতে কেবলমাত্র অল্প বৃদ্ধি লক্ষ করা যায়। কেবলমাত্র সকালে, মুখমণ্ডলের ফোলাভাব এই রোগের সর্বপ্রথম লক্ষণ।

উচ্চ রক্তচাপ

যদি কোনও ৩০ বছরের কম বয়স্ক ব্যক্তির উচ্চরক্তচাপ হয়ে থাকে এবং নির্ণয়ের সময় রক্তচাপ যদি খুব বেশি থাকে (যেমন ২২০/১১০), আর ওষুধ খাওয়া সত্ত্বেও যদি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ না হয়, তাহলে এর কারণ ক্রনিক কিডনি ফেলিওর হতে পারে।

মধ্যম অবস্থায় প্রকাশিত লক্ষণ

যখন কিডনির কর্মক্ষমতা ৬৫ থেকে ৮০ শতাংশ কমে যায় তখন রক্তে ক্রিয়েটিনিন এবং ইউরিয়ার মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। এই অবস্থাতেও বেশ কিছু রোগীর ক্ষেত্রে কোনও লক্ষণ দেখা যায় না। একই সময়ে বেশিরভাগ

খাবারে অরুচি, দুর্বলতা আর বিরক্তিভাব, কিডনি ফেলিওরের অধিকাংশ রোগীর মুখ্য লক্ষণ

রোগীর ক্ষেত্রে শারীরিক দুর্বলতা, রক্তাল্পতা, ফোলাভাব, উচ্চ রক্তচাপ, রাত্রে প্রস্রাবের মাত্রা বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়।

অন্তিম অবস্থায় প্রকাশিত লক্ষণ

যখন কিডনির কর্মক্ষমতা ৮০ শতাংশ কমে যায় অর্থাৎ শুধুমাত্র ২০ শতাংশই কর্মক্ষম থাকে, তখন কিডনি ফেলিওরের লক্ষণ বাড়তে থাকে। তথাপি কিছু রোগীর ক্ষেত্রে ওষুধ দ্বারা চিকিৎসার মাধ্যমে স্বাস্থ্য সন্তোষজনক থাকে। যখন কিডনির কর্মক্ষমতা ৮৫ শতাংশ ৯০ শতাংশ পর্যন্ত কমে যায়, অর্থাৎ কেবলমাত্র ১০ থেকে ১৫ শতাংশই কর্মক্ষম থাকে, সেই অবস্থাকে এন্ড স্টেজ কিডনি ফেলিওর (End Stage Kidney Failure) বলে। কিডনি ফেলিওরের এই অবস্থায় ওষুধ খাওয়া সত্ত্বেও রোগীর লক্ষণ বা যন্ত্রণা কম করা যায় না এবং ডায়ালিসিস বা কিডনি প্রতিস্থাপনের দরকার হয়ে পড়ে।

কিডনি অত্যধিক খারাপ হলে রক্তের শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়াতে জল, অম্ল বা ক্ষারের সমতা রাখার প্রক্রিয়া দৃষ্টান্তমূলকভাবে কমে যায় এবং রোগীর কষ্ট বা যন্ত্রণা বাড়তে থাকে।

এন্ড স্টেজ কিডনি ফেলিওরের সাধারণ লক্ষণ

প্রত্যেক রোগীর কিডনি খারাপ হবার লক্ষণ আর তার গভীরতা আলাদা আলাদা হয়। রোগের এই অবস্থায় নিম্নলিখিত লক্ষণ পাওয়া যায়—

- খাবারে অরুচি, বমিভাব।
- দুর্বলতা, ওজন কমে যাওয়া।
- অল্প কাজের পরে অত্যধিক ক্লান্তি, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট।
- রক্ত ফ্যাকাসে হওয়া, রক্তাল্পতা (অ্যানিমিয়া)। কিডনির দ্বারা প্রস্তুত এরিথ্রোপোয়েটিন নামক হরমোনের মাত্রা কমে যাবার কারণে রক্ত কমে যায়।
- শরীরে চুলকানি হওয়া।
- স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়া, ঘুমের নিয়মিত প্রক্রিয়াতে পরিবর্তন আসা।
- ওষুধ খাবার পরেও উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ না হওয়া।
- মহিলাদের মাসিক চক্রে পরিবর্তন বা অনিয়ম এবং পুরুষদের নপুংসকতা।
- কিডনি দ্বারা প্রস্তুত সক্রিয় ভিটামিন-ডি-উৎপাদন কমে যাওয়া, যার ফলে শিশুদের উচ্চতা কম বাড়ে এবং বয়স্কদের হাড়ের যন্ত্রণা হতে থাকে।

ওষুধ খাওয়া সত্ত্বেও যদি রক্তের ফ্যাকাসেভাব না যায় তাহলে তা ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের সংকেত হতে পারে।

এন্ড স্টেজ কিডনি ফেলিওরের গভীর লক্ষণ

কিডনি ফেলিওরের কারণে উদ্ভূত অসুবিধা বাড়ার পরেও যদি রোগের সঠিক চিকিৎসা না হয় তাহলে নিম্নলিখিত মারাত্মক অসুবিধা হতে পারে যা মৃত্যুর কারণ পর্যন্ত হতে পারে।

- অত্যধিক শ্বাসকষ্ট
- রক্তবমি
- রোগীর নিদ্রাচ্ছন্নভাব, শরীর মোচড়, জ্ঞানহীন হয়ে যাওয়া।
- রক্তে পটাশিয়ামের মাত্রা বাড়ার ফলে হৃদযন্ত্রের উপর গভীর প্রভাব পড়ে, যার ফলে হৃদযন্ত্র হঠাৎ বন্ধ পর্যন্ত হতে পারে।

নির্ণয়

যে কোনও রোগীর রোগলক্ষণ দেখে বা অন্য রোগ নির্ণয়ের সময় যদি কিডনি ফেলিওরের আশঙ্কা হয় তাহলে তা নিম্নলিখিত পরীক্ষার দ্বারা পুরোপুরি নির্ণয় সম্ভব।

১. রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা :

এর মাত্রা ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের রোগীদের ক্ষেত্রে কম হয়।

২. প্রস্রাবের পরীক্ষা :

যদি প্রস্রাবে প্রোটিন আসে তাহলে তা ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের প্রথম অশনি সংকেত হতে পারে। এটাও সত্য যে প্রস্রাবে প্রোটিনের আসা কিডনি ফেলিওর ছাড়াও অন্য কোনও রোগের লক্ষণ হতে পারে। এর দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, প্রস্রাবে প্রোটিন আসা মানেই সেটা কিডনি ফেলিওরের কারণ নয়। প্রস্রাবে সংক্রমণের নির্ণয়ও এই পরীক্ষার মাধ্যমে করা হয়।

৩. রক্তে ক্রিয়েটিনিন আর ইউরিয়ার পরীক্ষা :

ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের নির্ণয় এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে এটি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা।

কিডনি বেশি খারাপ হবার সঙ্গে সঙ্গে রক্তে ক্রিয়েটিনিন এবং ইউরিয়ার মাত্রা বাড়তে থাকে। কিডনি ফেলিওর রোগীদের নিয়মিতরূপে এই পরীক্ষা করানোর ফলে কিডনি কতটা খারাপ হয়েছে বা চিকিৎসার ফলে কতটা উন্নতি হয়েছে তা জানা যায়।

উচ্চ রক্তচাপ আর প্রস্রাবে প্রোটিন এই রোগের প্রথম সংকেত হতে পারে।

৪. কিডনির সোনোগ্রাফি :

কিডনির ডাক্তারের তৃতীয় নেত্র বলে পরিচিত এই পরীক্ষাটি কিডনি কী কারণে খারাপ হয়েছে তা জানার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অধিকাংশ কিডনি ফেলিওরের রোগীদের ক্ষেত্রে কিডনি আকারে ছোট এবং সংকুচিত হয়ে যায়। অ্যাকিউট কিডনি ফেলিওর, ডায়াবিটিস, অ্যামাইলোডোসিস ইত্যাদির কারণে যখন কিডনি খারাপ হয় তখন কিডনির আকার বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। পাথর, মূত্রমার্গের অবরোধ এবং পলিসিসটিক কিডনি ডিজিজের মতো কিডনি ফেলিওরের কারণের সঠিক চিকিৎসার জন্য সোনোগ্রাফির ব্যবহার করা যেতে পারে।

৫. রক্তের অন্যান্য পরীক্ষা :

ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের রোগীদের রক্তের অন্যান্য পরীক্ষার মধ্যে সিরাম ইলেকট্রোলাইটস, ক্যালসিয়াম, ফসফেট, প্রোটিন, বাইকার্বনেট ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ। কিডনি না কাজ করার ফলে উদ্ভূত অন্যান্য সমস্যা এইসব পরীক্ষাগুলির মাধ্যমে জানা যায়।

দুটি কিডনিই খারাপ হবার পরেও সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে রোগী দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সুস্থ থাকতে পারে।

অধ্যায় ১২.
ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের চিকিৎসা

ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের চিকিৎসা প্রধানত তিন প্রকার-

১. ঔষধ পথ্য,

২. ডায়ালিসিস এবং

৩. কিডনি প্রতিস্থাপন।

● ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের (ক্রনিক কিডনি ডিজিজ CKD) প্রারম্ভে যখন কিডনি খুব বেশি খারাপ হয়নি তখন রোগ নির্ণয়ের পরে ওষুধ এবং খাদ্যপানীয়ে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয়।

● দুটি কিডনি খারাপ হবার ফলে যখন কিডনির কার্যক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়, তখন ডায়ালিসিস করানোর দরকার হয়ে পড়ে আর কিছু রোগী কিডনি প্রতিস্থাপনের মতো বিশেষ চিকিৎসার সাহায্য নেয়।

ঔষধ পথ্য দ্বারা চিকিৎসা

ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের রোগীদের ওষুধ পথ্য দ্বারা চিকিৎসা গুরুত্বপূর্ণ কেন?

কিডনি অত্যধিক খারাপ হবার পরে প্রয়োজনীয় ডায়ালিসিস এবং কিডনি প্রতিস্থাপন করার খরচ খুবই বেশি এবং সব জায়গাতে পাওয়া যায় না, একইসঙ্গে রোগীর সম্পূর্ণ সুস্থ হবার কোনও গ্যারেন্টি থাকে না। ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের শুরুতে চিকিৎসা ওষুধ পথ্য দ্বারা কম খরচে সহজে সব জায়গাতে করানো যায়।

ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের কিছু সংখ্যক রোগী কি ওষুধ পথ্যের চিকিৎসা দ্বারা উপকৃত হতে অসফল থাকেন?

ক্রনিক কিডনি ফেলিওর শুরু থেকেই সঠিক চিকিৎসা কিডনিকে খারাপ হওয়া থেকে বাঁচায়। কিন্তু প্রারম্ভে এই রোগের লক্ষণ কম দেখা যায় এবং রোগী তার নিত্তনৈমিত্তিক কাজকর্ম সহজেই করতে পারে। এই কারণে ডাক্তারের তথ্য

ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের রোগে প্রারম্ভিক চিকিৎসা খুবই লাভজনক হয়।

ও পরামর্শ সত্ত্বেও, রোগী বা রোগীর আত্মীয়রা রোগের গভীরতা এবং সময়ে চিকিৎসা করানোর লাভ বুঝতে অসমর্থ হয়।

কিছু রোগীর ক্ষেত্রে চিকিৎসা সম্বন্ধে অজ্ঞানতা বা কুসংস্কার দেখা যায়। অনিয়মিত, অযোগ্য আর অসম্পূর্ণ চিকিৎসার কারণে কিডনি খুব তাড়াতাড়ি খারাপ হতে থাকে এবং নির্ণয়ের কম সময়ের মধ্যে শরীর খুব বেশি খারাপ হবার কারণে ডায়ালিসিস বা কিডনি প্রতিস্থাপনের মতো ব্যয়বহুল চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে। চিকিৎসাতে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা কিছু ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ পর্যন্ত হতে পারে।

ওষুধ পথ্য দ্বারা চিকিৎসা করার উদ্দেশ্য কী?

ক্রনিক কিডনি ফেলিওরে ওষুধপথ্য দ্বারা চিকিৎসা করার উদ্দেশ্য হল :

১. রোগীকে রোগের কারণে উদ্ভূত অসুবিধা থেকে মুক্তি দেওয়া।
২. কিডনির বর্তমান কর্মক্ষমতাকে বজায় রাখা এবং বেশি খারাপ হবার অবস্থা থেকে কিডনিকে বাঁচানো অর্থাৎ কিডনি খারাপ হবার তীব্রতাকে কম করা।
৩. সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্বাস্থ্য বজায় রাখা আর ডায়ালিসিস বা কিডনি প্রতিস্থাপনের প্রয়োজনকে বিলম্বিত করা।

ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের চিকিৎসা ওষুধপথ্য দ্বারা কীভাবে করা হয়?

ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের ওষুধ দ্বারা মুখ্য চিকিৎসাগুলি হল নিম্নরূপ :

১. ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের কারণের চিকিৎসা :

- ডায়াবিটিস তথা উচ্চ রক্তচাপের উচিত চিকিৎসা।
- প্রস্রাবের সংক্রমণের জরুরি চিকিৎসা।
- পাথরের জরুরি অপারেশন বা দূরীকরণ দ্বারা চিকিৎসা।

২. কিডনির কর্মক্ষমতা বজায় রাখার চিকিৎসা :

- উচ্চ রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখা।
- শরীরের উচিত জলের মাত্রা বজায় রাখা।
- শরীরে বর্ধিত অম্লের মাত্রার (অ্যাসিডোসিস) চিকিৎসার জন্য সোডিয়াম বাইকার্বনেট অর্থাৎ সোডামিন্টের ব্যবহার করা, যা এক প্রকার ক্ষার।

৩. ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের কারণে উদ্ভূত লক্ষণের চিকিৎসা :

এই রোগকে প্রতিরোধ করার জন্য কিডনি খারাপ হবার কারণের সঠিক চিকিৎসা করানো দরকার।

- উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রিত রাখা
- ফোলাভাব কম রাখার জন্য প্রস্রাবের মাত্রা বাড়ানোর ওষুধ (ডাইইউরেটিক্স) দেওয়া।
- বমি, শারীরিক অস্বস্তি, অ্যাসিডিটি ইত্যাদির বিশেষ ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা।
- হাড়কে মজবুত করার জন্য ক্যালসিয়াম এবং সক্রিয় ভিটামিন 'ডি' (Alpha D3, Rocaltrol) দ্বারা চিকিৎসা করানো।
- রক্তের ফ্যাকাসে (অ্যানিমিয়া) ভাবের চিকিৎসার জন্য আয়রন এবং ভিটামিন ওষুধ এবং বিশেষ ওষুধ এরিথ্রোপোয়েটিনের ইনজেকশন দেওয়া।

৪. কিডনির সম্ভাব্য ক্ষতিকে প্রতিরোধ :

- কিডনির জন্য ক্ষতিকারক ওষুধ যেমন কিছু অ্যান্টিবায়োটিকস যন্ত্রণানাশক ওষুধ, আয়ুর্বেদিক ভস্ম, ব্যবহার করা উচিত নয়।
- কিডনির জন্য ক্ষতিকারক অন্যান্য রোগের (যেমন বমি, পায়খানা, ম্যালেরিয়া, সেপ্টিসেমিয়া) শীঘ্র চিকিৎসা করানো দরকার।
- কিডনির সরাসরি ক্ষতি করে এমন রোগ যেমন—পাথর, মূত্রমার্গের সংক্রমণ ইত্যাদির সময়ে এবং শীঘ্র চিকিৎসা।
- ধূমপান, তামাক, গুটখার সেবন তথা মদ্যপান না করা।

৫. ক্রনিক কিডনি ফেলিওর হবার পর সম্ভাব্য চিকিৎসার প্রস্তুতি :

- রোগ নির্ণয়ের পরে বামহাতের শিরাকে (Veins) ক্ষতির থেকে বাঁচানোর জন্য, শিরার থেকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য রক্ত নেওয়া উচিত নয়, কোনও ইনজেকশন দেওয়া উচিত নয়, এবং গ্লুকোজ বোতলও লাগানো উচিত নয়।
- কিডনি বেশি খারাপ হবার পরে বামহাতের ধমনী শিরাকে জুড়ে এ. ভি. ফিস্টুলা (Arterio Venous Fistula) বানানো প্রয়োজন, যেটা দীর্ঘ সময় হিমোডায়ালিসিস করানোর জন্য দরকার।
- হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন-এর কোর্স যদি শীঘ্র নেওয়া যায় তাহলে ডায়ালিসিস বা কিডনি প্রতিস্থাপনের সময় হেপাটাইটিস বি এবং সংক্রমণের আশঙ্কা থেকে বাঁচা সম্ভব।

৬. খাদ্য পানীয়র নিয়ন্ত্রণ :

- **লবণ (সোডিয়াম) :** উচ্চ রক্তচাপ (হাই ব্লাডপ্রেসার)-কে নিয়ন্ত্রণে রাখতে

শরীরের বা প্রস্রাবের সংক্রমণের উপর শীঘ্র এবং সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কিডনি খারাপ হওয়া থেকে বাঁচাতে সাহায্য করে।

আর ফোলাভাব কম করার জন্য লবণ কম খাওয়া দরকার। এইসব রোগীদের খাদ্যে প্রতিদিন ৩ গ্রামের বেশি লবণ থাকা উচিত নয়। অধিক লবণযুক্ত খাবার যেমন পাঁপড়, আচার আম-আচার, পটাটো চিপস, ওয়েফার্স ইত্যাদি খাওয়া উচিত নয়।

- **জলের মাত্রা :** প্রস্রাব কম হবার ফলে শরীরে ফোলাভাব এবং শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট হতে পারে। যখন শরীরে ফোলাভাব থাকে তখন জল এবং অন্যান্য পানীয় কম মাত্রায় গ্রহণ করা দরকার, যার দ্বারা ফোলাভাবকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। অত্যধিক ফোলাভাবকে কম করার জন্য ২৪ ঘন্টায় হওয়া প্রস্রাবের কম পরিমাণ জল খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

- **পটাশিয়াম :** কিডনি ফেলিওরের রোগীদেরকে অধিক পটাশিয়াম যুক্ত খাবার যেমন ফল, ডাবের জল ইত্যাদি না খাবার পরামর্শ দেওয়া হয়। পটাশিয়ামের বর্ধিত মাত্রা হৃদয় যন্ত্রের উপর গভীর প্রভাব ফেলে মৃত্যুর কারণ পর্যন্ত হতে পারে।

- **প্রোটিন :** কিডনি ফেলিওরের রোগীদেরকে অধিক প্রোটিনযুক্ত খাবার না খাবার পরামর্শ দেওয়া হয়। নিরামিষাশী রোগীদের খাদ্য পানীয়ে অধিক পরিবর্তনের দরকার হয় না। নিম্ন ধরনের প্রোটিনযুক্ত খাদ্য যেমন ডাল কম মাত্রায় খাবার পরামর্শ দেওয়া হয়।

- **ক্যালোরি :** শরীরে ক্যালোরির উচিত মাত্রা (৩৫ Kcal/Kg) শরীরেব অনাবশ্যক পোষণ এবং প্রোটিন-এর অনাবশ্যক ক্ষয় প্রতিরোধের জন্য জরুরি।

- **ফসফেট :** ফসফেটযুক্ত পদার্থ কিডনি ফেলিওরের রোগীদের কম মাত্রায় গ্রহণ করা দরকার।

  কিডনি ফেলিওরের রোগীদের খাদ্য পানীয় সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য ২৭ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের ওষুধ দ্বারা চিকিৎসার মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কোনটি ?

এই রোগের চিকিৎসাতে উচ্চ রক্তচাপকে সর্বদা নিয়ন্ত্রণে রাখা সবথেকে

কিডনির সুরক্ষার জন্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা হল রক্তচাপ সর্বদা নিয়ন্ত্রণে রাখা

গুরুত্বপূর্ণ। কিডনি ফেলিওরের অধিকাংশ রোগীদের ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপ দেখা যায় যা ক্ষতিগ্রস্ত কমজোর কিডনির আরও ক্ষতি করে থাকে।

রক্তচাপ কম করার জন্যে কোনও ওষুধ সবথেকে উপযোগী?

উচ্চ রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রিত রাখার জন্য ওষুধ দ্বারা সঠিক চিকিৎসা কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ নেফ্রোলজিস্ট বা ফিজিসিয়ান করে থাকেন। রক্তচাপ কম করার জন্য ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব-কার্স, বিটা ব-কার্স, ডাইইউরেটিক্স ইত্যাদি ওষুধের প্রয়োগ করা হয়।

কিডনি ফেলিওরের প্রথম অবস্থায় এ. সি ই অথবা এ. আর বি ধরনের ওষুধের বিশেষ রূপে ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের ওষুধ উচ্চ রক্তচাপ কম করার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত কিডনিকে অধিক খারাপ করার প্রক্রিয়াকে মন্থর করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কার্য করে থাকে।

ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের রোগীদের রক্তচাপ কত থাকা দরকার?

কিডনিকে অধিক খারাপ হবার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য রক্তচাপ সর্বদা ১৪০/৮০-এর নীচে থাকা দরকার।

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে আছে কি না, সেটা কীভাবে জানা সম্ভব? এর জন্য কোনো পদ্ধতি সর্বশ্রেষ্ঠ?

রক্তচাপ সর্বদা ১৪০/৮০-এর নীচে থাকা দরকার।

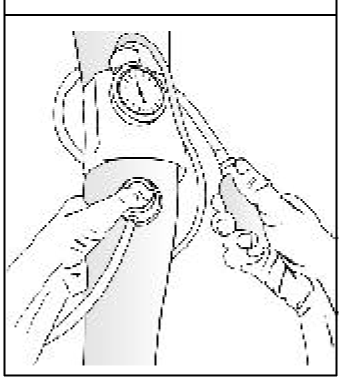

নিয়মিতরূপে ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়ে রক্তচাপ মাপালে জানা যায় যে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে আছে কি না। কিডনির সুরক্ষার জন্য রক্তচাপ সর্বদা নিয়ন্ত্রণে থাকা খুবই জরুরি। যেমনভাবে ডায়াবিটিস (মধুমেহ)-এর রোগী নিজেই গ্লুকোমিটারের মাধ্যমে রক্তের শর্করার (সুগার) মাত্রা মাপতে পারেন, ঠিক তেমনভাবেই যদি রোগীর পরিবারের কোনও ব্যক্তি ব্লাডপ্রেসার মাপা শিখে নেন, তাহলে সেটাই হবে শ্রেষ্ঠ উপায়। রোজ ব্লাড প্রেসার মেপে এবং তা ডায়েরিতে নোট করে যদি ডাক্তারবাবুকে দেখানো যায় তাহলে ডাক্তারবাবু তা অধ্যয়ন করে ওষুধের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে পারেন।

কিডনি ফেলিওর ব্যবহৃত ডাইইউরেটিক্স নামক ওষুধ কী?

কিডনি ফেলিওরে প্রস্রাব কম হবার কারণে ফোলাভাব থাকে এবং শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট হতে পারে।

ডাইইউরেটিক্স নামে পরিচিত ঔষধাবলি প্রস্রাবের মাত্রা বাড়িয়ে ফোলাভাব কমাতে এবং শ্বাসকষ্ট কম করতে সাহায্য করে। এটা মনে রাখা দরকার যে এই ওষুধগুলি প্রস্রাব বাড়াতে সাহায্য করে, কিন্তু কিডনির কার্যক্ষমতা বাড়াতে কোনও সাহায্য করে না।

কিডনি ফেলিওরে ফ্যাকাসে রক্তের চিকিৎসা কী? :

এর জন্য প্রয়োজনীয় আয়রন এবং ভিটামিনযুক্ত ওষুধ দেওয়া হয়। যখন কিডনি অত্যধিক খারাপ হয়ে যায়। এই ধরনের রোগীদের বিশেষ ওষুধ এরিথ্রোপোয়েটিন এর ইনজেকশন দেওয়া হয়। এই ইনজেকশনের প্রভাবে রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বাড়ে। যদিও এই ইনজেকশন সুরক্ষিত, ফলপ্রসূ ব্যবহার করা সম্ভব, তবুও ব্যয়বহুল হবার কারণে সমস্ত রোগী এই ওষুধের ব্যয়বহন করতে পারে না। এই ধরনের রোগীদের জন্য রক্তগ্রহণ কম খরচে হয় কিন্তু এতে অনেক বিপদের ঝুঁকি বেশি।

ফ্যাকাসে রক্তের চিকিৎসা জরুরি কেন?

রক্তের হিমোগ্লোবিন, ফুসফুস থেকে অক্সিজেন নিয়ে পুরো শরীরে পৌঁছানোর গুরুত্বপূর্ণ কার্য করে। রক্ত ফ্যাকাসে হওয়া মানে রক্তে কম হিমোগ্লোবিনের মাত্রার সংকেত দেয়। এর ফলে রোগী দুর্বলতা অনুভব করে এবং বমিও হতে পারে। অল্প পরিশ্রমের পরেই শ্বাসকষ্ট হয়, বুকের যন্ত্রণা হয়। শরীরের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা কমে যায়, এবং আরও অনেক অসুবিধা হয়। এইজন্য কিডনি ফেলিওরের রোগীদের সুস্বাস্থ্যের জন্য ফ্যাকাসে রক্তর চিকিৎসা অতি আবশ্যক। রক্ত কমে যাবার খারাপ প্রভাব হৃদযন্ত্রের কার্যক্ষমতার উপরেও পড়তে পারে। ঠিক এই কারণে রক্তের পরিমাণ ঠিক রাখার জন্য হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ বাড়ানো অত্যন্ত আবশ্যক।

৭. নেফ্রোলজিস্ট দ্বারা সময়ে নির্ণয় এবং চিকিৎসা :

ক্রনিক কিডনি ফেলিওরে রক্তের ফ্যাকাসে ভাবের চিকিৎসার শ্রেষ্ঠ উপায় ওষুধ এবং এরিথ্রোপোয়েটিন।

- কিডনিকে সম্ভাব্য ক্ষতির থেকে বাঁচানোর জন্য রোগীর নিয়মিতরূপে নেফ্রোলজিস্টের সঙ্গে দেখা করে পরামর্শ নেওয়া এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করানো অত্যন্ত জরুরি।
- নেফ্রোলজিস্ট, রোগীর কষ্ট বা অসুবিধা এবং কিডনির কার্যক্ষমতার অধ্যয়ন করে জরুরি চিকিৎসা করেন।

ক্রনিক কিডনি ফেলিওরে স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা ঠিক রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ

অধ্যায় ১৩.
ডায়ালিসিস

যখন দুটি কিডনিই কাজ করা বন্ধ করে দেয়, তখন কিডনির কাজ কৃত্রিম পদ্ধতিতে চালানোকে ডায়ালিসিস বলে।

ডায়ালিসিসের কাজ কী?

ডায়ালিসিসের মুখ্য কার্যগুলি হল নিম্নরূপ :

১. রক্তের অনাবশ্যক বর্জ্য পদার্থ যেমন ক্রিয়েটিনিন, ইউরিয়াকে দূর করে রক্তের পরিশোধন করা।

২. শরীরে জমা অধিক জলকে দূর করে শরীরে তরল পদার্থের সঠিক মাত্রা বজায় রাখা।

৩. শরীরের ক্ষারদ্রব্য যেমন সোডিয়াম, পটাশিয়াম ইত্যাদির উচিত মাত্রায় প্রতিস্থাপন করা।

৪. শরীরে জমা অম্লের (অ্যাসিড) অধিক মাত্রাকে কম করে উচিত মাত্রায় প্রতিস্থাপন করা।

ডায়ালিসিসের কখন দরকার পড়ে?

যখন কিডনির কার্যক্ষমতা অত্যধিক কমে যায় বা কিডনি পুরোপুরি কাজ করা বন্ধ করে দেয়, তখন ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা করা সত্ত্বেও কিডনি রোগের লক্ষণ (যেমন বমি, শারীরিক অস্বস্তি, শারীরিক দুর্বলতা, শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট ইত্যাদি) বাড়তে থাকে। এই অবস্থায় ডায়ালিসিসের দরকার পড়ে। সাধারণত, যদি রক্ত পরীক্ষায় সিরাম ক্রিয়েটিনিন-এর মাত্রা 8-10 মি. গ্রা প্রতি ডেসিলিটার এর বেশি পাওয়া যায়, তাহলেই ডায়ালিসিস করা উচিত।

ডায়ালিসিস করালে কি পুনরায় কিডনি কাজ করতে শুরু করে?

না, ক্রনিক ফেলিওর রোগীদের ডায়ালিসিস করানোর পরেও কিডনি পুনরায় কাজ করে না। এই ধরনের রোগীদের ক্ষেত্রে ডায়ালিসিস কিডনির কার্যের বিকল্প

ডায়ালিসিস কিডনির কার্য কৃত্রিমরূপে করে থাকে

হিসাবে কাজ করে এবং স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য নিয়মিতরূপে বাকি জীবনের জন্য ডায়ালিসিস করানো দরকার।

কিন্তু অ্যাকিউট কিডনি ফেলিওরের রোগীদের অল্প সময়ের জন্যই ডায়ালিসিস করানোর দরকার পড়ে। এই ধরনের রোগীদের কিডনি কিছু দিনের মধ্যেই পুরোপুরি কাজ করতে শুরু করে এবং পরে রোগীদের ডায়ালিসিস বা ওষুধ খাবার দরকার হয় না।

ডায়ালিসিস কত প্রকারের হয়?

ডায়ালিসিস দুই প্রকারের :

১. হিমোডায়ালিসিস (Haemodialysis) : এই ধরনের ডায়ালিসিসে ডায়ালিসিস মেশিন, বিশেষ প্রকার ক্ষারযুক্ত দ্রব্যের (Dialysate) সাহায্যে কৃত্রিম কিডনি (Dialyser) রক্তের পরিশোধন করে থাকে।

২. পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস (Peritonial Dialysis) : এই ধরনের ডায়ালিসিসে, পেটের মধ্যে এক বিশেষ প্রকারের ক্যাথিটার নালী (P. D. Catheter) ঢুকিয়ে, বিশেষ প্রকার ক্ষারযুক্ত দ্রব্য (P. D. Fluid) এর সাহায্যে, শরীরে জমা অনাবশ্যক পদার্থ দূর করে পরিশোধন করানো হয়। এই ধরনের ডায়ালিসিসে মেশিনের দরকার পড়ে না।

ডায়ালিসিসে রক্তের শুদ্ধিকরণ কোন পদ্ধতিতে হয়?

- হিমোডায়ালিসিসে কৃত্রিম কিডনির কৃত্রিম ঝিল্লি আর পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিসে পেটের পেরিটোনিয়াম মেমব্রেন (সেমিপারমিয়েবল মেমব্রেন) কিডনির মতো কাজ করে।
- ঝিল্লি-র (মেমব্রেন) বিশেষ ছিদ্রের মধ্যে ছোট পদার্থ যেমন জল ক্ষার তথা অনাবশ্যক ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন বেরিয়ে যায়। কিন্তু শরীরের প্রয়োজনীয় বড় পদার্থ (অণু, পরমাণু) যেমন রক্তকণা ইত্যাদি বেরোতে পারে না।
- ডায়ালিসিসের প্রক্রিয়াতে সেমিপারমিয়েবল মেমব্রেন-এর একদিকে ডায়ালিসিসের তরল থাকে আর অন্যদিকে রক্ত থাকে।
- অসমোসিস এবং ডিফিউসন-এর নিয়ম অনুসারে রক্তের অনাবশ্যক পদার্থ এবং অতিরিক্ত জল রক্ত থেকে ডায়ালিসিস তরলের মধ্য দিয়ে শরীরের

দুটি কিডনি খারাপ হবার পরেও পরেও রোগী ডায়ালিসিসের মাধ্যমে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সহজে বাঁচতে পারে।

বাইরে বেরিয়ে যায়। কিডনি ফেলিওরের কারণে পরিবর্তিত সোডিয়াম, পটাশিয়াম তথা অ্যাসিডের মাত্রা ঠিক করার গুরুত্বপূর্ণ কাজও এই প্রক্রিয়ায় হয়ে থাকে।

কোন রোগীর হিমোডায়ালিসিস আর কোনও রোগীর পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস দ্বারা চিকিৎসা করানো উচিত?

ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের চিকিৎসায় দুটি পদ্ধতিই কার্যকরী। রোগীকে দুই ধরনের ডায়ালিসিসের ব্যাপারে তথ্যাবলি দেবার পর, রোগীর আর্থিক অবস্থা, শারীরিক অবস্থা, বাড়ির থেকে হিমোডায়ালিসিস কেন্দ্রের দূরত্ব ইত্যাদি বিচার বিবেচনা করে কোনও ধরনের ডায়ালিসিস করানো হবে সেই সিদ্ধান্তে আসা হয়। ভারতবর্ষের অধিকাংশ জায়গাতে হিমোডায়ালিসিস কম খরচে সহজ সরলভাবে করানো যায়। এই কারণে, হিমোডায়ালিসিস করান এমন রোগীর সংখ্যা ভারতবর্ষে অনেক বেশি।

ডায়ালিসিস শুরু করানোর পরে রোগীদের খাদ্য পানীয়ের নিয়ন্ত্রণ দরকারী কি?

হ্যাঁ, রোগীর ডায়ালিসিস শুরু করার পরে, খাদ্য এবং জল বা অন্যান্য পানীয়র উপর নিয়ন্ত্রণ, কম লবণ এবং পটাশিয়াম, ফসফেটস গ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়। কিন্তু শুধুমাত্র ওষুধের দ্বারা চিকিৎসা করাচ্ছেন এরকম রোগীদের তুলনায় ডায়ালিসিস করাচ্ছেন এমন রোগীদের খাদ্য পানীয়তে নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা হয় এবং বেশি প্রোটিন, ভিটামিনযুক্ত আহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

হিমোডায়ালিসিস (রক্তের ডায়ালিসিস)

সমগ্র বিশ্বে ডায়ালিসিস করান এমন রোগীদের একটা বড় অংশ এই ধরনের ডায়ালিসিস করান। এই ধরনের ডায়ালিসিসে হিমোডায়ালিসিস মেশিন দ্বারা রক্তের পরিশোধন করা হয়।

হিমোডায়ালিসিস কীভাবে করা হয়?

- হিমোডায়ালিসিস মেশিনের ভিতরে অবস্থিত পাম্প দ্বারা শরীর থেকে প্রতি মিনিটে ২৫০-৩০০ মি. লি. রক্ত পরিশোধন করার জন্য কৃত্রিম কিডনিতে পাঠানো হয়। রক্ত যাতে তঞ্চিত (জমে যাওয়া) না হয় তার জন্য হেপারিন নামক ওষুধের প্রয়োগ করা হয়।

ডায়ালিসিস করাচ্ছেন এমন রোগীদের খাদ্য পানীয়ের নিয়ন্ত্রণ থাকা দরকার

- কৃত্রিম কিডনি রোগী এবং হিমোডায়ালিসিস মেশিনের মধ্যে থেকে রক্ত পরিশোধন করে। রক্ত পরিশোধিত হবার জন্য হিমোডায়ালিসিস মেশিনের ভিতরে যায় না।
- কৃত্রিম কিডনিতে রক্তের পরিশোধন, ডায়ালিসিস, মেশিন দ্বারা পৌঁছানো বিশেষ তরলের (Dialysate) সাহায্যে করা হয়।
- পরিশোধিত রক্ত পুনরায় শরীরে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।
- সাধারণত হিমোডায়ালিসিস প্রক্রিয়া চার ঘন্টা পর্যন্ত চলে, এই সময়ের মধ্যে রক্ত প্রায় ১০-১২ বার পরিশোধিত হয়।
- হিমোডায়ালিসিস প্রক্রিয়াতে সর্বদা রক্ত দেবার (Blood transfusion) এর দরকার হয়, এই ধারণা ভুল। যদি রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কমে গিয়ে থাকে, তাহলে সেই অবস্থায় যদি ডাক্তারবাবু আবশ্যক মনে করেন তবেই রক্ত দেওয়া হয়।

পরিশোধনের জন্য রক্ত কীভাবে শরীরের বাইরে আনা হয়?

রক্ত বাইরে আনার (Vascular access) জন্য নিম্নলিখিত মুখ্য পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়-

১. সিংগল লুমেন, ফিমোরাল ক্যাথেটার এবং 16F জেলকো
২. ডবল লুমেন ক্যাথিটার
৩. এ. ভি. ফিস্টুলা
৪. গ্র্যাফট্

রক্ত বাইরে আনার জন্য নিম্নলিখিত মুখ্য পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়		
গলাতে শিরা	**কাঁধের শিরা**	**উরুতে শিরা**
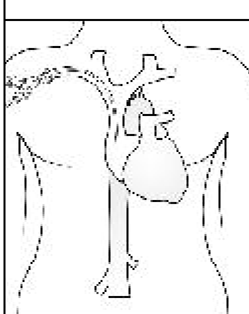		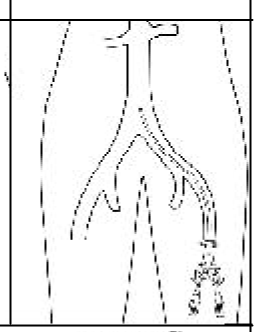
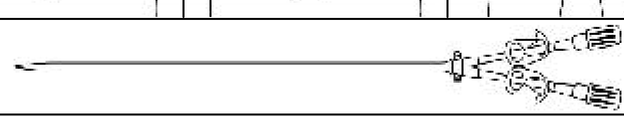		

১. সিংগল লুমেন ফিমোরাল ক্যাথিটার

সিংগল লুমেন ফিমোরাল ক্যাথিটার পায়ের ফুটকিতে ফিমোরাল ভেনের মধ্যে দেওয়া হয়। রক্ত পরিশোধিত হয়ে 16F জেলকোর মাধ্যমে হাতের মধ্যে চলে যায়। এই পদ্ধতিতে সঙ্গে সঙ্গে ডায়ালিসিস করা সম্ভব। ফিমোরাল ক্যাথিটার সর্বাধিক ৩-৫ দিন পর্যন্ত রাখা যেতে পারে। কেবলমাত্র হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীর ক্ষেত্রে।

২. ডবল লুমেন ক্যাথিটার

- আপৎকালীন পদ্ধতিতে হঠাৎ করে প্রথমবার ডায়ালিসিস করানোর জন্য এটি হল সর্বাধিক প্রচলিত পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে শিরার মধ্যে ক্যাথিটার প্রবেশ করিয়ে তৎক্ষণাৎ ডায়ালিসিস করা হয়।
- এই ক্যাথিটার গলাতে, কাঁধে বা উরুতে অবস্থিত প্রধান শিরাতে (internal jugular subclavian or femoral vein) প্রবেশ করানো হয়, যার সাহায্যে প্রত্যেক মিনিটে ৩০০ থেকে ৪০০মি.লি রক্ত পরিশোধনের জন্য বের করা হয়।
- এই ক্যাথিটার শরীরের বাইরের অংশে দুভাগে বিভাজিত আলাদা আলাদা হিসাবে থাকে। ক্যাথিটারের একটি ভাগ রক্তকে শরীরের বাইরে বের করার জন্য এবং অন্যভাগ শরীরে রক্ত প্রবেশ করানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। শরীরে প্রবেশ করার আগে ক্যাথিটারের দুটি ভাগ এক হয়ে যায় যা পরে আবার শরীরের ভিতরে দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়।
- ক্যাথিটারে সংক্রমণের আশঙ্কার জন্য কম সময়ে (৩-৬ সপ্তাহ) হিমোডায়ালিসিস করানোর জন্যই এই পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়।

৩. এ. ভি. ফিস্টুলা

(Arterio Venous [A.V.] Fistula)

দীর্ঘ সময় কয়েক মাস বা বছর পর্যন্ত হিমোডায়ালিসিস করানোর জন্য এই পদ্ধতি সবথেকে বেশি উপযোগী এবং সুরক্ষিত।

- এই পদ্ধতিতে হাতের কব্জির শিরা এবং ধমনী অপারেশন দ্বারা জুড়ে দেওয়া হয়।
- ধমনীতে (Artery) অধিক মাত্রায় এবং চাপের সাথে আসা রক্ত শিরাতে (Vein) যায়, যার ফলে হাতের সমস্ত শিরা ফুলে যায়।
- এইভাবে শিরার ফুলতে তিন থেকে চার সপ্তাহের মতো সময় লাগতে পারে। এর পরেই হিমোডায়ালিসিস করানোর জন্য এই শিরার উপযোগ করা হয়।

এ. ভি. ফিস্টুলা

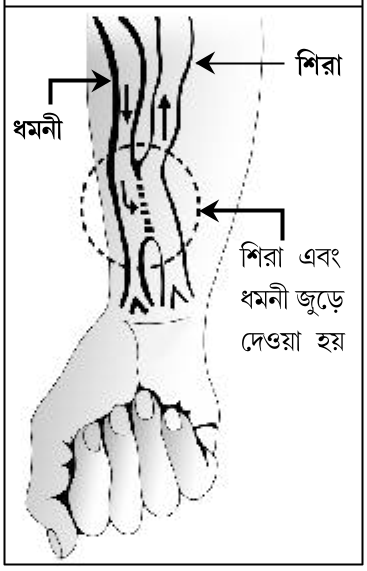

- এই কারণে প্রথমবার তৎক্ষণাৎ হিমোডায়ালিসিস করানোর জন্য তৎক্ষণাৎ ফিস্টুলা বানিয়ে তার ব্যবহার করা যায় না।
- এই ফোলা শিরাতে দুটি ভিন্ন জায়গায় বিশেষ ধরনের দুটি মোটা সুচ (ফিস্টুলা নিডল Fistula Needle) প্রবেশ করানো হয়।
- এই ফিস্টুলা নিডল এর সাহায্যে হিমোডায়ালিসিস-এর জন্য রক্ত বাইরে আনা হয় এবং পরিশোধনের পর শরীরের ভিতরে পৌঁছানো হয়।
- ফিস্টুলার সাহায্যে কয়েক বছর পর্যন্ত হিমোডায়ালিসিস করা সম্ভব।
- ফিস্টুলা যুক্ত হাতের দ্বারা সমস্ত হাল্কা দৈনিক কাজকর্ম করা সম্ভব।

এ. ভি ফিস্টুলার বিশেষ রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন কেন?

- ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের অন্তিম অবস্থায়, রোগীদের হিমোডায়ালিসিসের প্রয়োজন হয়। এইসব রোগীদের জীবন নিয়মিত ডায়ালিসিসের উপর নির্ভরশীল। এ. ভি. ফিস্টুলা যদি ঠিকঠাক কাজ করে তবেই হিমোডায়ালিসিস এর জন্য পর্যাপ্ত রক্ত নেওয়া সম্ভব।
  সংক্ষেপে ডায়ালিসিস করান এমন রোগীদের জীবন এ. ভি. ফিস্টুলার কার্যক্ষমতার উপর নির্ভরশীল।
- এ. ভি. ফিস্টুলার স্ফীত শিরার মধ্যে অধিক চাপের সঙ্গে অনেক বেশি রক্ত প্রবাহিত হয়। যদি এ. ভি. ফিস্টুলাতে হঠাৎ চোট লাগে তাহলে, স্ফীত শিরাগুলির মধ্যে থেকে অত্যধিক মাত্রায় রক্তক্ষরণ হবার সম্ভাবনা থাকে। এমত অবস্থায় রক্তচাপের উপর যদি শীঘ্র নিয়ন্ত্রণ না করা যায় তাহলে অল্প সময়ের মধ্যে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

এ. ভি. ফিস্টুলা থেকে যদি সর্বদা পর্যাপ্ত রক্ত নেওয়া সম্ভব হয় তবেই সঠিকভাবে হিমোডায়ালিসিস সম্ভব।

এ. ভি. ফিস্টুলাকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সঠিকভাবে উপযোগ করার জন্য প্রয়োজনীয় সাবধানতাগুলি কী?

এ. ভি. ফিস্টুলার ডায়ালিসিস সাহায্যে দীর্ঘ সময় (কয়েক বছর) পর্যন্ত মাত্রায় ডায়ালিসিস -এর জন্য রক্ত পাওয়া যায় তার জন্য নিম্নলিখিত কথা মাথায় রাখা আবশ্যক :

১. নিয়মিত শরীরচর্চা করা। ফিস্টুলা বানানোর পরে শিরা ফুলে থাকে আর পর্যাপ্ত মাত্রায় রক্ত পাওয়া যায় তার জন্য হাতের ব্যায়াম নিয়মিত করা দরকার। ফিস্টুলার সাহায্যে হিমোডায়ালিসিস শুরু করার পরেও হাতের ব্যায়াম নিয়মিত করা দরকার।

২. রক্তের চাপ কমে যাবার ফলে, ফিস্টুলার উপর গভীর প্রভাব পড়তে পারে এবং ফিস্টুলা বন্ধ হবার আশঙ্কা থাকে। এই কারণে রক্তচাপ খুব বেশি না কমে তার দিকে নজর রাখা দরকার।

৩. ফিস্টুলা করানোর পরে প্রত্যেক রোগীর নিয়মিত রূপে দিনে অন্তত তিনবার (সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা) এটা পরীক্ষা করে নেওয়া দরকার যে ফিস্টুলা ঠিক কাজ করছে কি না। এইভাবে সাবধান হলে, যদি ফিস্টুলা হঠাৎ করে কাজ বন্ধ করে দেয় তাহলে তৎক্ষণাৎ তার চিকিৎসা সম্ভব।
   যার ফিস্টুলা কাজ করছে না তার শীঘ্র চিকিৎসা নির্ণয় এবং চিকিৎসার মাধ্যমে ফিস্টুলা পুনরায় কাজ করতে পারে।

৪. ফিস্টুলা যুক্ত হাতের শিরায় কখনও ইনজেকশন নেওয়া উচিত নয়। ওই শিরাতে গ্লুকোজ বা রক্ত দেওয়া উচিত নয় বা পরীক্ষা করার জন্য রক্ত নেওয়া উচিত নয়।

৫. ফিস্টুলাযুক্ত হাতে ব্লাডপ্রেসার মাপা উচিত নয়।

৬. ফিস্টুলাযুক্ত হাতের সাহায্যে কোনও ভারী জিনিস ওঠানো উচিত নয়। একসঙ্গে এটাও নজর রাখা দরকার যে যেন ওই হাতে চাপ না পড়ে। বিশেষভাবে শোবার সময় যেন চাপ না পড়ে তা লক্ষ রাখা দরকার।

৭. ফিস্টুলাতে যেন কোনও আঘাত না লাগে তা বিশেষভাবে লক্ষ রাখা প্রয়োজন। ওই হাতে ঘড়ি, গহনা (কড়া, ধাতুর চুড়ি) ইত্যাদি যা হাতের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে তা পরা উচিত নয়। যদি কোনও কারণে হঠাৎ ফিস্টুলাতে আঘাত লাগে এবং রক্তক্ষরণ হয় তাহলে ভীতসন্ত্রস্ত না হয়ে অন্য হাত দ্বারা জোরে

হিমোডায়ালিসিস-এর রোগীদের এ. ভি. ফিস্টুলা জীবনভোর হবার কারণে এর রক্ষণাবেক্ষণ জরুরি

চেপে ধরে রক্তক্ষরণ উল্লেখযোগ্যভাবে কম করা সম্ভব। এর পরে শীঘ্র ডাক্তারবাবুর সঙ্গে সম্পর্ক করা দরকার। রক্তক্ষরণকে বন্ধ না করে ডাক্তারের কাছে যাওয়া মৃত্যুর কারণ পর্যন্ত হতে পারে।

৮. ফিস্টুলাযুক্ত হাতকে পরিষ্কার রাখা দরকার এবং হিমোডায়ালিসিস করানোর আগে হাতকে জীবাণুনাশক সাবান দ্বারা ধোওয়া দরকার।

৯. হিমোডায়ালিসিসের পরে ফিস্টুলা থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্য বিশেষ পট্টি (tourniquet) জোরে বাঁধা হয়। যদি দীর্ঘ সময় ধরে এই পট্টি বাঁধা থাকে, তাহলে ফিস্টুলা বন্ধ হবার আশঙ্কা থাকে।

৪. গ্রাফট (Graft)

- যেসব রোগীদের হাতের শিরার স্থিতি ফিস্টুলার উপযুক্ত নয়, সেইসব রোগীদের জন্য গ্রাফটের উপযোগ করা হয়।
- এই পদ্ধতিতে বিশেষ ধরনের প্লাস্টিকের মতো পদার্থের দ্বারা প্রস্তুত কৃত্রিম নালীর সাহায্যে অপারেশন করে হাত বা পায়ের মুখ্য শিরা এবং ধমনীকে জুড়ে দেওয়া হয়।
- ফিস্টুলা নিডলকে গ্রাফটের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে হিমোডায়ালিসিস এর জন্য রক্ত নেওয়া এবং ফিরে পাঠানো হয়।
- প্রচন্ড ব্যয়বহুল হবার কারণে এই পদ্ধতির প্রয়োগ খুব কমসংখ্যক রোগীর ক্ষেত্রেই করা হয়।

হমোডায়ালিসিস মেশিনের কাজ কী?

১. হিমোডায়ালিসিস মেশিনের পাম্প রক্ত পরিবেশন করার জন্য রক্ত নেওয়া এবং প্রয়োজন অনুসারে রক্তের মাত্রা কম বা বেশি করার কাজ করে।

২. মেশিন বিশেষ ধরনের তরল (ডায়ালাইজেট) বানিয়ে কৃত্রিম কিডনি (ডায়ালাইজার) তে পাঠায়। মেশিন ডায়ালাইজেটের তাপমাত্রা, ক্ষারের পরিমাণ, বাইকার্বনেটের উচিত মাত্রা বানিয়ে রাখে। মেশিন এই ডায়ালাইজেটকে উচিত মাত্রা এবং চাপে কৃত্রিম কিডনিতে পাঠায় আর রক্তের অনাবশ্যক পদার্থ দূর করার পরে ডায়ালাইজেটকে বাইরে বের করে দেয়।

৩. কিডনি ফেলিওরে শরীরের ফোলাভাব, অতিরিক্ত জল জমা হবার কারণে হয়। ডায়ালিসিস প্রক্রিয়াতে মেশিন শরীর থেকে অতিরিক্ত জল বের করে

হিমোডায়ালিসিস মেশিন কৃত্রিম কিডনির সাহায্যে রক্ত পরিশোধন করে এবং জল, ক্ষার অম্ল-এর উচিত মাত্রা বজায় রাখে।

দেয়।

৪. হিমোডায়ালিসিস চলাকালীন রোগীর সুরক্ষার জন্য বেশ কিছু ব্যবস্থা মেশিনে থাকে।

ডায়ালাইজার (কৃত্রিম কিডনি) কীভাবে তৈরি হয়?

ডায়ালাইজারের গঠন

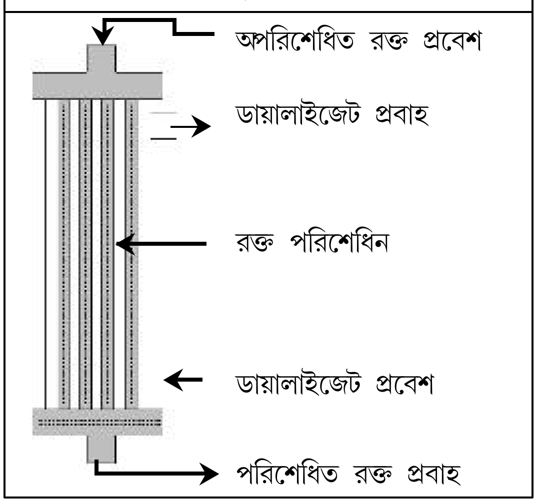

ডায়ালাইজার সাধারণত ৮ ইনচ লম্বা ১.৫ ইনচ ক্যাসের স্বচ্ছ প্লাস্টিক পাইপ দ্বারা তৈরি হয়, যার মধ্যে ১০,০০০ চুলের মতো পাতলা নালী থাকে। এইসব নালী পাতলা তবুও ভেতর থেকে খালি হয়। এই সমস্ত নালী বিশেষ ধরনের প্লাস্টিকের সেমি পারমিয়েবল (Semi permeable) পদার্থ দ্বারা প্রস্তুত। এইসব পাতলা নালীর মধ্য দিয়েই রক্ত প্রবাহিত হয়ে পরিশেধিত হয়।

- ডায়ালাইয়ের উপরের তথা নীচের অংশে এই সমস্ত নালী এক জায়গায় জড়ো হয়ে বড় নালীর আকার নেয়। যার সঙ্গে শরীর থেকে রক্ত আনার এবং নিয়ে যাবার মোটা নালী (Blood Tubings) জুড়ে দেওয়া হয়।
- ডায়ালাইজারের এবং নীচের অংশের কিনারাতে মোটা নালী জোড়া থাকে, যার মধ্যে মেশিনে পরিশোধনের জন্য প্রবাহিত ডায়ালাইজেট তরল বাইরে ভিতরে আদান প্রদান করতে পারে।

ডায়ালাইজারেতে (কৃত্রিম কিডনি) রক্তের পরিশোধন :

- শরীর থেকে পরিশোধনের জন্য আসা রক্ত, কৃত্রিম কিডনির এক দিক থেকে

হিমোডায়ালিসিসে রোগীর যন্ত্রণা হয় না, এবং রোগী বিছানায় শুয়ে বা চেয়ারে বসে থাকা অবস্থায় স্বাভাবিক কাজ করতে পারেন।

হিমোডায়ালিসিস প্রক্রিয়া

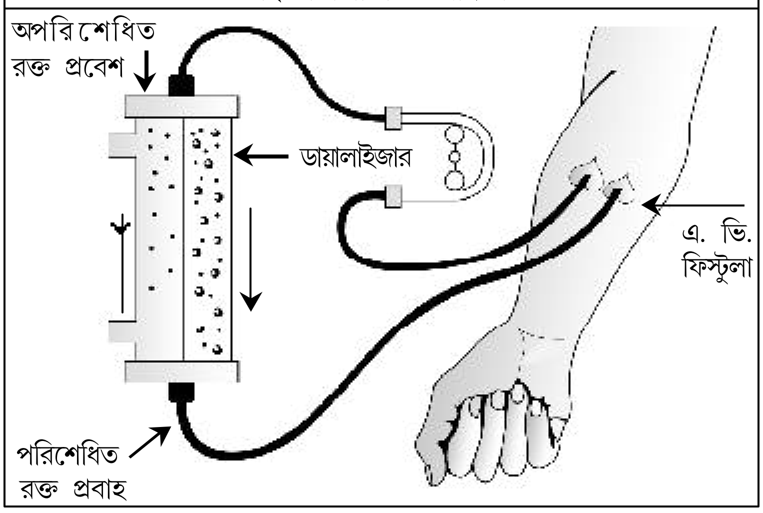

ভিতরে প্রবেশ করে হাজারো পাতলা নালীর মধ্যে অবস্থান করে। কৃত্রিম কিডনিতে অন্য দিক থেকে আসা উচ্চচাপযুক্ত ডায়ালাইজেট তরল রক্তের পরিশোধনের জন্য নালীগুলির চারপাশে অবস্থান করে।

- ডায়ালাইজারের মধ্যে রক্ত উপর থেকে নীচে এবং ডায়ালাইজেট তরল নীচের থেকে উপরের দিকে অর্থাৎ একসাথে বিপরীত দিকে প্রবাহিত হতে থাকে।
- এই প্রক্রিয়াতে অর্ধচ্ছেদ্য ঝিল্লির (Semi Permeable Membrane) দ্বারা তৈরি পাতলা নালীতে অবস্থিত রক্তের ক্রিয়েটিনিন ইউরিয়া এবং অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ ডায়ালাইটেজ এর সঙ্গে মিলে বাইরে বেরিয়ে যায়। এইভাবে, একদিক থেকে কৃত্রিম কিডনিতে আসা অশুদ্ধ রক্ত অন্যদিক থেকে পরিশোধিত হয়ে বেরিয়ে যায়।
- ডায়ালিসিস প্রক্রিয়াতে প্রায় শরীরের পুরো রক্ত বাইরে বেরিয়ে যায় এবং পরিশোধিত হয়। চার ঘন্টার ডায়ালিসিস প্রক্রিয়ার পরে, রক্তে ক্রিয়েটিনিন এবং ইউরিয়ার মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায় এবং রক্ত শুদ্ধ হয়ে যায়।

রক্তের পরিশোধন এবং অতিরিক্ত জল দূর করার কাজ ডায়ালাইজারে হয়

হিমোডায়ালিসিসে যে বিশেষ প্রকার তরল দ্বারা রক্ত পরিশোধন করা হয়, সেই ডায়ালাইজেট কী?

- হিমোডায়ালিসিসের প্রয়োজনীয় বিশেষ প্রকারের অত্যধিক ক্ষারযুক্ত তরল (Acid concentrate) দশ লিটারের প্লাস্টিক জারে পাওয়া যায়।
- হিমোডায়ালিসিস মেশিন এই কনসেনট্রেটের একভাগ এবং ৩৪ ভাগ বিশুদ্ধ জল এবং ক্ষার (Bicarbonate) মিশিয়ে ডায়ালাইজেট বানায়।
- হিমোডায়ালিসিস মেশিন ডায়ালাইজেট এর ক্ষার তথা বাইকার্বনেটের মাত্রা শরীরের প্রয়োজনীয় মাত্রার সমান রাখে।
- ডায়ালাইটেজ বানানোর জন্য প্রয়োজনীয় জল, ক্ষাররহিত, লবণযুক্ত এবং শুদ্ধ হয়, যা বিশেষ ধরনের আর ও প্লান্ট (Reverse Osmosis Plant জল শুদ্ধিকরণ যন্ত্র)-এর সাহায্যে বানানো হয়।
- এই আর, ও, প্লান্টে জল বালির ছাঁকনি, কয়লার ছাঁকনি। মাইক্রো ফিলটার, ডি আয়োনাইজার, আর ও মেমব্রেন এবং ইউ, ভি ফিল্টারের সাহায্যে লবণমুক্ত, শুদ্ধ এবং পুরোপুরি জীবাণুমুক্ত হয়ে যায়।
- হিমোডায়ালিসিস সুরক্ষিত এবং ফলপ্রসূ করার জন্য জলের পুরোপুরি বিশুদ্ধ হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

হিমোডায়ালিসিস কোথায় করা হয়?

সাধারণত হিমোডায়ালিসিস হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ স্টাফ দ্বারা নেফ্রোলজিস্টের পরামর্শ অনুসারে এবং তদারকিতে করা হয়।

খুবই কম ক্ষেত্রে রোগী হিমোডায়ালিসিস মেশিন কিনে, প্রশিক্ষণ নিয়ে পরিবারের সদস্যদের সাহায্যে ঘরেই হিমোডায়ালিসিস করান। এই ধরনের ডায়ালিসিসকে হোম হিমোডায়ালিসিস বলে। এর জন্য প্রচুর অর্থ, প্রশিক্ষণ এবং সময়ের দরকার হয়। শিখে নেওয়ার পরে রোগী নিজেই নিজের ডায়ালিসিস করতে পারে। মেশিন ঠিক করা, ফিস্টুলা নিডল দেওয়া ইত্যাদি নিজে নিজেই করা সম্ভব।

হিমোডায়ালিসিস কি যন্ত্রণাদায়ক বা জটিল চিকিৎসা?

না, হিমোডায়ালিসিস একটি সরল এবং যন্ত্রণাহীন চিকিৎসা। যেসব রোগীদের দীর্ঘসময় পর্যন্ত ডায়ালিসিসের দরকার হয় তারা কেবলমাত্র হিমোডায়ালিসিস প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে বাড়ি ফিরে যান। অধিকাংশ রোগী এই প্রক্রিয়ার মধ্যের

হিমোডায়ালিসিস সরল, পীড়ারহিত, ফলপ্রসূ চিকিৎসা

চার ঘন্টা সময় শুয়ে, আরাম করে, টি.ভি. দেখে, গান শুনে বা নিজের পছন্দমত বই পড়ে অতিবাহিত করেন। অনেক রোগী এই সময়ে হাল্কা জলখাবার চা খেতে বা অন্যান্য ঠাণ্ডা পানীয় পান করতে পছন্দ করেন।

সাধারণত ডায়ালিসিসের সময় কোন কোন অসুবিধা হতে পারে?

ডায়ালিসিসের সময় উদ্ভুত অসুবিধাগুলির মধ্যে রক্তচাপ কমে যাওয়া, পেটের যন্ত্রণা, দুর্বলতা, বমিভাব, হেঁচকি, অস্বস্তি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

হিমোডায়ালিসিসের প্রধান লাভ এবং ক্ষতি কী?

হিমোডায়ালিসিসের প্রধান লাভ :

- কম খরচে ডায়ালিসিস-এর চিকিৎসা।
- হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ স্টাফ এবং ডাক্তারের দ্বারা করা হয় এজন্য এই প্রক্রিয়া সুরক্ষিত।
- কম সময়ে বেশি ফলদায়ক চিকিৎসা।
- সংক্রমণের সম্ভাবনা খুব কম।
- রোজ করানোর দরকার হয় না।
- অন্য রোগীদের সঙ্গে পরিচয় বা বার্তালাপের ফলে মানসিক অবস্থা ভাল থাকে রোগীর।

হিমোডায়ালিসিসের প্রধান লোকসান :

- এই সুবিধা প্রত্যেক শহরে/গ্রামে না থাকার কারণে, বারবার দূরে যাবার অসুবিধা হয়।
- চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে সময়মত আসতে হয়।
- বার বার ফিস্টুলা নিডল লাগানো যন্ত্রণাদায়ক।
- হেপাটাইটিসের সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। (যদি রক্ত নেওয়ার দরকার হয়, রক্ত নেওয়ার সময়ই হেপাটাইটিস বি/সি আসে।)
- খাদ্য পানীয়তে নিয়ন্ত্রণ রাখতে হয়।
- হিমোডায়ালিসিস ইউনিট চালু করা খুব ব্যয়বহুল এবং তা চালানোর জন্য বিশেষজ্ঞ স্টাফের দরকার।

হিমোডায়ালিসিসের রোগীদের জন্য জরুরি সূচনা :

- নিয়মিত হিমোডায়ালিসিস করানো দীর্ঘ, সুস্বাস্থ্যের জন্য জরুরি। এতে অনিয়ম

হিমোডায়ালিসিসের মুখ্য লাভ সুরক্ষা, বেশি প্রভাবশীল কম ব্যয়ে চিকিৎসা

বা পরিবর্তন শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক।

- দুটি ডায়ালিসিসের মধ্যের বর্ধিত শারীরিক ওজনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য খাদ্য পানীয়ের নিয়ন্ত্রণ (জল এবং লবণ কম খাওয়া) দরকার।
- হিমোডায়ালিসিসের সাথে রোগীদের নিয়মিত রূপে ওষুধ খাওয়া, রক্তচাপ এবং ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা দরকার।

পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস (পেটের ডায়ালিসিস)

কিডনি ফেলিওরের রোগীদের যখন ডায়ালিসিসের প্রয়োজন হয় তখন হিমোডায়ালিসিস ছাড়াও দ্বিতীয় বিকল্প হল পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস।

পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস (P.D.) কী?

- পেটের ভিতর অন্ত্র (Intestine), লিভার ইত্যাদি তথা অন্যান্য অঙ্গকে নিজের জায়গায় ধরে রাখে পেরিটোনিয়াম (ঝিল্লি)
- এই ঝিল্লি সেমিপারমিয়েবল অর্থাৎ অর্ধচ্ছেদ্য হয়।
- এই ঝিল্লির সাহায্যে করা রক্তের পরিশোধন প্রক্রিয়াকে পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস বলে।

পরবর্তী বিবরণে পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিসকে আমার পি. ডি. নামে জানব।

পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস (P.D.) কত প্রকারের?

পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস মুখ্যত তিন প্রকারের—

১. আই. ভি. ডি.—ইস্টারমিটেন্ট পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস (Intermitent Peritoneal Dialysis)

২. সি. এ. পি. ডি.—কনটিনিউয়াস অ্যামবুলেটারি পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস (Continious Ambulatory Peritoneal Dialysis)

৩. সি. সি. পি. ডি—কনটিনিউয়াস সাইক্লিক পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস (Continious Cycle Peritoneal Dialysis)

আই, পি. ডি.—ইন্টারমিটেন্ট পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস :

হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের যখন অ্যাকিউিট ফেলিওর জন্য ডায়ালিসিস- এর দরকার হয় এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

আই. পি. ডি.তে রোগীকে অজ্ঞান না করে, নাভির নীচে তলপেটে বিশেষ ওষুধের

সি. এ. পি. ডি রোগীর দ্বারা বাড়িতে বিনা মেশিনে, বিশেষ প্রকার তরল দ্রব্যের সাহায্যে করা হয় এমন ডায়ালিসিস

সি.এ.পি.ডি. প্রক্রিয়া

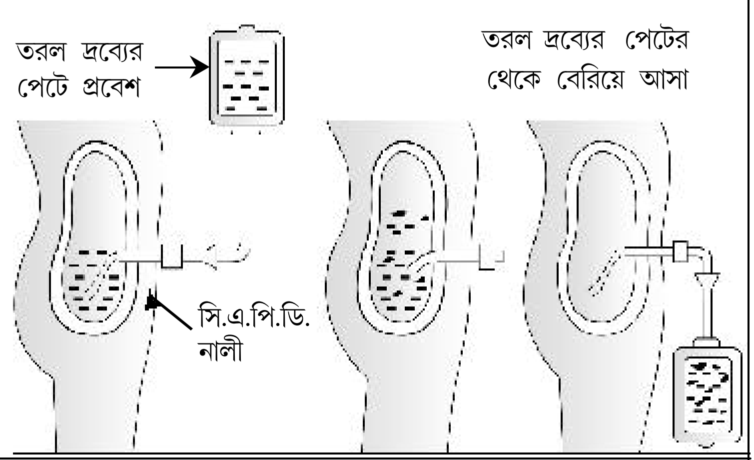

পি.ডি. নালীর গঠন

দ্বারা অবশ করা হয়। এই জায়গাতে একটি ছিদ্রযুক্ত মোটা নালী পেটে প্রবেশ করানো হয় এবং বিশেষ প্রকার তরল দ্রব্যের সাহায্যে (Peritoneal Dialysis Fluid) রক্ত পরিশোধন করা হয়।

- সাধারণত এই ডায়ালিসিস প্রক্রিয়া ২৪-৩৬ ঘন্টা পর্যন্ত চলে এবং সেই সময়ের মধ্যে ৩০ থেকে ৪০ লিটার তরলের উপযোগী রক্তের পরিশোধনের জন্য করা হয়।
- এই ধরনের ডায়ালিসিস প্রতি তিন থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে করাতে হয়।
- এই পদ্ধতিতে রোগীকে চিত হয়েই শুয়ে থাকতে হয়। পাশ ফিরে শোওয়া চলে না। এই কারণে দীর্ঘ সময়ের জন্য এই পদ্ধতি সুবিধাজনক নয়।

সি. এ. পি. ডি. প্রতিদিন, নিয়মিত রূপে করা দরকার

২. কনটিনিউয়াস অ্যামবুলেটারি পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস (CAPD) :

CAPD কী?

সি. এ. পি. ডি -এর মানে—

সি.—কনটিনিউয়াস, যাতে ডায়ালিসিস প্রক্রিয়া সর্বক্ষণ চালু থাকে।

এ.—অ্যামবুলেটারি, এই প্রক্রিয়া চলার সময় রোগী চলতে ফিরতে পারে এবং সাধারণ কাজকর্ম করতে পারে।

পি. ডি.—পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিসের প্রক্রিয়া।

সি. এ. পি. ডি. তে রোগী নিজে নিজেই বাড়িতে থেকে স্বয়ং বিনা মেশিনে ডায়ালিসিস করতে পারে পৃথিবীর কিছু কিছু দেশ যেমন কানাডা, মেক্সিকো, হংকং, থাইল্যান্ড ইত্যাদি দেশে ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের রোগীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির ব্যবহার করে থাকে।

সি. এ. পি. ডি. প্রক্রিয়া :

- এই ধরনের ডায়ালিসিসে অনেক ছিদ্রযুক্ত নালী (CAPD Catheter) তলপেটে নাভির নিচে ছোট ব্যান্ডেজ লাগিয়ে রাখা হয়।
- এই নালী সিলিকন-এর মতো বিশেষ পদার্থ দ্বারা তৈরি করা হয়। এটি নরম এবং নমনীয় হয় এবং পেট অথবা বৃহদন্ত্রের অঙ্গগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে, সহজে পেটের মধ্যে থাকতে পারে।
- এই নালী দ্বারা দিনে 3 থেকে 4 বার দুই লিটার ডায়ালিসিস তরল পেটে ঢালা হয় এবং নির্দিষ্ট সময় পরে তা বের করে নেওয়া হয়।
- পি. ডি.র তরল যতক্ষণ পেটের মধ্যে থাকে, তাকে ডুয়েল টাইম (Dwell Time) বলে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে রক্তের বর্জ্য পদার্থ ডায়ালিসিস তরলে ছেঁকে চলে আসে এবং রক্ত পরিশোধিত হয়ে যায়।
- ডায়ালিসিসের জন্য ব্যবহৃত প্লাস্টিকের নরম থলির মধ্যের দু-লিটার তরল পেটের মধ্যে ঢেলে দেবার পরে, খালি থলি কোমরে পট্টির সাহায্যে বেঁধে আরামে চলাফেরা করা যেতে পারে।
- এই ডায়ালিসিস প্রক্রিয়া পুরো দিন চলতে থাকে এবং পুরো দিনে, দু থেকে তিনবার ডায়ালিসিস তরল বদলানো হয়। পি. ডি.র তরল বদলানোর সময় ছাড়া রোগী বাকি সময় চলাফেরা, ছোটখাট কাজকর্ম বা চাকরিও করতে

সি. এ. পি. ডির রোগীদের প্রোটিনযুক্ত আহার করা দরকার।

পারে।

- পেট থেকে বেরিয়ে আসা বর্জ্য পদার্থযুক্ত অশুদ্ধ তরল, সেই প্লাস্টিকের থলির মধ্যেই বেরিয়ে আসে এবং তা ফেলে দেওয়া হয়।

সি. এ. পি. ডি'র রোগীদের আহারে কী কী মুখ্য পরিবর্তন করার পরামর্শ দেওয়া হয়?

সি. এ. পি. ডির এই প্রক্রিয়াতে পেটের থেকে বেরিয়ে আসা তরলের সাথে প্রোটিনও শরীর থেকে বেরিয়ে আসে। এই কারণে নিয়মিত রূপে অধিক প্রোটিনযুক্ত আহার করা সুস্বাস্থ্যের জন্য অতি আবশ্যক।

রোগী কতটা লবণ, পটাশিয়ামযুক্ত পদার্থ এবং জল খেতে পারবেন তার মাত্রা ডাক্তারবাবু রক্তচাপ, শরীরের ফোলাভাব এবং ল্যাবরেটরি পরীক্ষার রিপোর্ট দেখে নিশ্চিত করেন।

সি. এ. পি. ডির চিকিৎসা চলাকালীন রোগীদের মুখ্য ভয়ের কারণগুলি কী?

- সি. এ. পি. ডির সম্ভাব্য ভয়ের কারণের মধ্যে পেরিটোনাইটিস (পেটে পুঁজ হওয়া), সি. এ. পি. ডি. ক্যাথিটার যেখান দিয়ে বের হয় সেখানে সংক্রমণ (Exit Site Infection) হওয়া, পাতলা পায়খানা হওয়া ইত্যাদি অন্যতম।
- সি. এ. পি. ডির রোগীদের সর্বাধিক চিন্তাজনক ভয়/বিপদ হল পেরিটোনাইটিস যার অর্থ পেরিটোনিয়াম-এর সংক্রমণ।
- পেটের যন্ত্রণা হওয়া, জ্বর আসা, পেট থেকে বের হওয়া তরল যদি অপরিষ্কার হয়, তাহলে তা পেরিটোনাইটিস-এর সংকেত ধরে নেওয়া হয়।

সি. এ. পি. ডির মুখ্য লাভ এবং লোকসান কী?

সি. এ. পি. ডির মুখ্য লাভ :

- ডায়ালিসিস-এর জন্য রোগীকে হাসপাতালে যাবার দরকার হয় না। রোগী নিজেই বাড়িতেই এই ডায়ালিসিস করতে পারেন।
- স্থান এবং কালের অসুবিধা হয় না। রোগী তাঁর রোজকার কাজ করতে পারেন এবং বাইরেও যেতে পারেন।
- খাদ্য এবং পানীয়তে কম নিয়ন্ত্রণের দরকার হয়।
- এই প্রক্রিয়া বিনা মেশিনের সাহায্যে হয়। সুচ ফোটানোর যন্ত্রণা থেকেও রোগী মুক্তি পেয়ে থাকেন।

সংক্রমণ যাতে না হয় তার জন্য সাবধানতা সি. এ. পি. ডি প্রক্রিয়ার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ

উচ্চ রক্তচাপ, ফোলাভাব, রক্তাল্পতা ইত্যাদির চিকিৎসা সরলভাবে করানো সম্ভব।

সি. এ. পি. ডির মুখ্য লোকসান/অসুবিধা :

- বর্তমানে এই চিকিৎসা ব্যয়বহুল।
- এতে পেরিটোনাইটিসের সম্ভাবনা থাকে।
- প্রতিদিন (বিনা ভুলে) তিন থেকে চার বার সাবধানতার সাথে সি. এ. পি. ডি তরল বদলাতে হয়। এর দায়িত্ব রোগীর পরিবারের লোকজনের হয়। এইভাবে প্রতিদিন, সঠিক সময়ে সাবধানতার সাথে সি. এ. পি. ডি করা মানসিক চাপের কারণ হতে পারে।
- পেটের মধ্যে সর্বদা ক্যাথিটার এবং তরল থাকা একটি সাধারণ সমস্যা।
- সি. এ. পি. ডির তরলের ভারী থলিকে সামলানো এবং তার সাথে চলা কষ্টকর।

সি. এ. পি. ডির মুখ্য লাভ হল স্থান ও কালের থেকে মুক্তি

অধ্যায় ১৪.
কিডনি প্রতিস্থাপন

কিডনি প্রতিস্থাপন (Kidney Transplantation) :

কিডনি প্রতিস্থাপনের চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির নিদর্শন। ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের অন্তিম অবস্থায় এটি একটি উত্তম বিকল্প। সফল কিডনি প্রতিস্থাপনের পরে রোগীর জীবন অন্যান্য মানুষের মতো সাধারণ এবং সুস্থ হয়।

কিডনি প্রতিস্থাপনের বিশদ বিবরণ চারভাগে করা হয় :

১. কিডনি প্রতিস্থাপনের আগে জানার তথ্য।
২. কিডনি প্রতিস্থাপনের অপারেশনের তথ্যাবলি।
৩. কিডনি প্রতিস্থাপনের পরে জানার তথ্য।
৪. ক্যাডেভার কিডনি প্রতিস্থাপন।

কিডনি প্রতিস্থাপনের আগে জানার তথ্য

কিডনি প্রতিস্থাপন কী?

ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের রোগীর শরীরে তথ্য ব্যক্তির (জীবিত বা মৃত) একটি সুস্থ কিডনি অপারেশন দ্বারা লাগানোকে কিডনি প্রতিস্থাপন বলে।

কিডনি প্রতিস্থাপনের দরকার কখন হয় না?

যে কোনও ব্যক্তির দুটি কিডনির মধ্যে যদি একটি খারাপ হয়ে যায় তাহলে শরীরের কিডনি সম্পর্কিত সমস্ত জরুরি কাজকর্ম অন্য সুস্থ কিডনির সাহায্যে সুষ্ঠুভাবে হতে পারে। অ্যাকিউট কিডনি ফেলিওরে, সঠিক চিকিৎসায় (ওষুধ এবং রোগীর ক্ষেত্রে অল্প সময়ের জন্য ডায়ালিসিস) কিডনি পুনরায় সম্পূর্ণ রূপে কাজ করতে থাকে। এইসব রোগীদের কিডনি প্রতিস্থাপনের দরকার হয় না।

কিডনি প্রতিস্থাপনের দরকার কখন হয়?

ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের রোগীদের দুটি কিডনিই যখন খুব বেশি (৮৫ শতাংশের বেশি) খারাপ হয়ে যায়, তখন ওষুধ খাওয়া সত্ত্বেও শরীর খুব বেশি খারাপ হতে থাকে এবং নিয়মিত ডায়ালিসিসের দরকার হয়। ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের

কিডনি প্রতিস্থাপনের আবিষ্কার ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের রোগীদের জন্য একটি বরদান

এইরকম রোগীদের দ্বিতীয় বিকল্প চিকিৎসা হল কিডনি প্রতিস্থাপন।

কিডনি প্রতিস্থাপন জরুরি কেন?

ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের রোগীদের দুটি কিডনিই যখন পুরোপুরি খারাপ হয়ে যায় তখন সুস্থ থাকার জন্য সপ্তাহে তিনবার নিয়মিত ডায়ালিসিস এবং ওষুধের দরকার হয়। এইসব রোগীদের সুস্বাস্থ্য নির্ধারিত দিন এবং সময়ে ডায়ালিসিস করানোর উপর নির্ভর করে। কিডনি প্রতিস্থাপনের পরে রোগীরা এইসব থেকে মুক্তি পান। সফল কিডনি প্রতিস্থাপনই হল ভালভাবে বাঁচার একমাত্র এবং ফলপ্রসূ উপায়।

কিডনি প্রতিস্থাপন থেকে কী কী লাভ হয়?

সফল কিডনি প্রতিস্থাপনের লাভ—

১. উন্নত জীবনের মান। রোগী সাধারণ সুস্থ ব্যক্তির মতো বাঁচতে পারেন এবং নিজের দৈনন্দিন কাজকর্ম করতে পারেন।
২. ডায়ালিসিস করানোর ঝামেলার থেকে মুক্তি পান।
৩. খাদ্য পানীয়তে কম নিয়ন্ত্রণের দরকার হয়।
৪. রোগী শারীরিক এবং মানসিকভাবে সুস্থ থাকেন।
৫. পুরুষের যৌন জীবনে কোনও অসুবিধা হয় না এবং মহিলাদের মা হওয়া সম্ভব।
৬. শুরুতে এবং প্রথম বছরের চিকিৎসার খরচ ছাড়া, সাধারণত চিকিৎসার খরচ কম হয়।

কিডনি প্রতিস্থাপনের লোকসান কী?

কিডনি প্রতিস্থাপনের দ্বারা উদ্ভূত বিপত্তিগুলি হল—

১. বড় অপারেশনের দরকার হয়, কিন্তু তা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত।
২. শুরুতে সফলতা পাওয়া সত্ত্বেও, কিছু রোগীর ক্ষেত্রে পরে কিডনি খারাপ হবার সম্ভাবনা থাকে।
৩. কিডনি প্রতিস্থাপনের পরে নিয়মিত ওষুধ খাবার দরকার হয়। শুরুতে এই সমস্ত ওষুধ খুবই চড়া দামের হয়। যদি ওষুধ সেবন অল্প সময়ের জন্য বন্ধ হয় বা নিয়মের বাইরে যায় তাহলে প্রতিস্থাপিত কিডনি বিকল হতে পারে।

সফল কিডনি প্রতিস্থাপনই হল ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের অন্তিম অবস্থার চিকিৎসার সর্বশ্রেষ্ঠ বিকল্প।

৪. এই চিকিৎসা খুবই ব্যয়বহুল। অপারেশন এবং হাসপাতালের খরচ, বাড়ি যাবার পরে নিয়মিত ওষুধের খরচ এবং বার বার ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা নিরীক্ষার খরচ ইত্যাদি খুবই ব্যয়বহুল (৩ থেকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হতে পারে।)

কিডনি প্রতিস্থাপনের পরামর্শ কখন দেওয়া হয় না?

রোগীর বয়স বেশি হলে, রোগী এডস বা ক্যানসারে পীড়িত হলে, কিডনি প্রতিস্থাপন জরুরি হওয়া সত্ত্বেও, করা হয় না। আমাদের দেশে শিশুদেরও খুবই কম কিডনি প্রতিস্থাপন করা হয়। কিডনি গ্রহণকারী (Recipient)-এর শরীরে অ্যান্টিবডি থাকলে (Cross match two) ট্রান্সপালন্টেশন করা সম্ভব নয়। অক্সালোসিস (Oxalosis) এবং নেফ্রিটাইটিস থাকলে ট্রান্সপ্লান্টেশন করা উচিত নয়।

কিডনি প্রতিস্থাপনের জন্য কিডনি দাতাকে কীভাবে পছন্দ করা হয়?

ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের রোগীদের যে কোনও ব্যক্তির কিডনিই কাজে আসে, এটা ঠিক। সর্বাগ্রে, রোগীর (যার কিডনি দরকার) ব্লাডগ্রুপের উপর নির্ভর করে, ডাক্তারবাবু নির্ণয় করেন যে কোনও ব্যক্তি কিডনি দিতে পারবেন।

কিডনি দাতা এবং কিডনি গ্রাহকের ব্লাডগ্রুপ ছাড়াও দুজনের রক্তের শ্বেতরক্তকণিকাকে উপস্থিত পদার্থ এইচ. এল. এ. (Human Leucocytes Antigen–HLA) এর মাত্রাতেও মিল থাকা দরকার। এইচ. এল. এর সমানতা টিসু টাইপিং নামক পরীক্ষার দ্বারা জানা যায়।

কিডনি কে দান করতে পারেন?

সাধারণত ১৮ থেকে ৫৫ বছর বয়স্ক ব্যক্তির কিডনিই নেওয়া হয়। স্ত্রী এবং পুরুষ দুজনে পরস্পরকে কিডনি দিতে পারেন। যমজ ভাই বা বোন আদর্শ কিডনিদাতা গণ্য করা হয়। কিন্তু ইহা সহজে পাওয়া যায় না। মাতা, পিতা, ভাই, বোন সাধারণত কিডনি দেবার জন্য পছন্দ করা হয়। যদি উপরোক্ত ব্যক্তির থেকে কিডনি না পাওয়া যায় তাহলে, পরিবারের অন্য লোকজন যেমন কাকা, পিসি, মামা, মাসি ইত্যাদির কিডনি নেওয়া যেতে পারে। যদি এটাই সম্ভব না হয় তাহলে পতি পত্নীর কিডনির পরীক্ষা করিয়ে দেখা যেতে পারে। বিকশিত দেশে, পারিবারিক সদস্যদের কাছ থেকে কিডনি না পাওয়া গেলে, 'ব্রেন ডেড' (মানসিকভাবে মৃত) ব্যক্তির কিডনি (ক্যাডাভার কিডনি) প্রতিস্থাপন করা হয়।

এড্স বা ক্যানসারের মতো গভীর রোগে আক্রান্ত রোগীদের কিডনি প্রতিস্থাপন করা হয় না

কিডনিদাতার কিডনি দেবার পরে কী কী অসুবিধা হয়?

কিডনি নেবার পূর্বে কিডনিদাতার সম্পূর্ণ শারীরিক পরীক্ষা করে নেওয়া হয়। ইহা সম্পূর্ণ নিশ্চিত করা হয় যে, কিডনিদাতার দুটি কিডনি সম্পূর্ণরূপে কার্যরত কি না এবং কিডনি দানের পরে দাতার কোনও অসুবিধা হবে কি না। একটি দান করার পরে, সাধারণত দাতার কোনও অসুবিধা হয় না এবং দাতা তাঁর দৈনন্দিন জীবনশৈলী পূর্বের ন্যায় করতে পারেন। দাতার বৈবাহিক জীবনেরও কোনও অসুবিধা হয় না। একটি কিডনি দেবার পরে দ্বিতীয় কিডনি পূর্ণরূপে কাজ করতে সক্ষম।

কিডনি প্রতিস্থাপনের অপারেশনের আগে রোগীর পরীক্ষা নিরীক্ষা :

অপারেশনের আগে কিডনি ফেলিওরের রোগীদের অনেক ধরনের শারীরিক, ল্যাবরেটরি এবং রেডিওলজিক্যাল পরীক্ষা করানো হয়।

রোগী অপারেশনের পূর্বে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ আছে কি না এবং এমন কোনও রোগে আক্রান্ত কি না যার কারণে অপারেশন সম্ভব নয়। এইসব সুনিশ্চিত করাই এইসব পরীক্ষার লক্ষ।

কিডনি প্রতিস্থাপনের অপারেশনের তথ্য

কিডনি প্রতিস্থাপনের অপারেশনে কী করা হয়?

কিডনি প্রতিস্থাপন

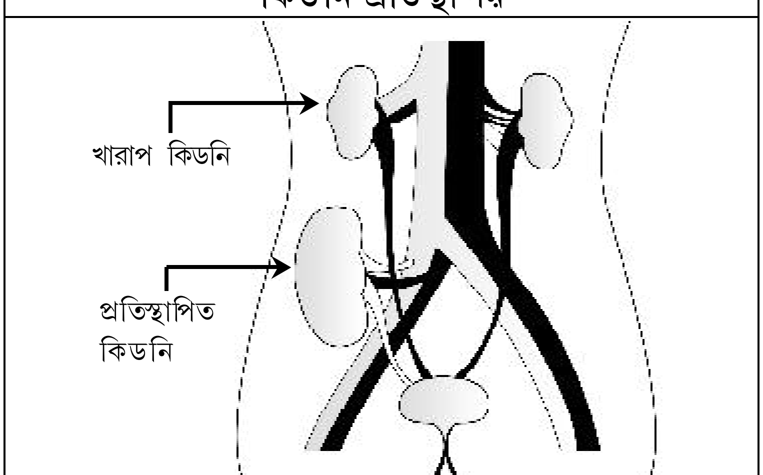

সফল কিডনি প্রতিস্থাপনের জন্য পারিবারিক সদস্যদের থেকে নেওয়া কিডনিই সর্বশ্রেষ্ঠ।

- ব্লাডগ্রুপ মেলার পরে, HLA এর মাত্রাতে সন্তোষজনক মিল আছে কি না তা সুনিশ্চিতরূপে করার পরেই কিডনি প্রতিস্থাপন করা হয়।
- অপারেশনের পূর্বে রোগী এবং কিডনিদাতার পরিবারের লোকজনের থেকে সম্মতি নেওয়া হয়। কিডনি প্রতিস্থাপনের অপারেশন একটি টিম করে থাকে। নেফ্রোলজিস্ট (কিডনি ফিজিশিয়ান) ইউরোলজিস্ট (কিডনি সার্জেন), প্যাথোলজিস্ট এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহায়কের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই অপারেশন করা হয়। এই অপারেশনের কাজ ইউরোলজিস্ট করে থাকেন।
- কিডনি দাতা এবং গ্রাহক দুজনের অপারেশন একসাথে করা হয়।
- কিডনি দাতার একটি কিডনি অপারেশন দ্বারা বের করার পরে তা এক বিশেষ প্রকারের ঠাণ্ডা তরলে পরিষ্কার করা হয়। পরে সেই কিডনি ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের রোগীর পেটের ডানদিকে, সামনের দিকে নীচের অংশে লাগানো হয়।
- সাধারণত রোগীর খারাপ কিডনি যুগলকে বাদ দেওয়া হয় না। কিন্তু যদি খারাপ কিডনি শরীরের ক্ষতি করতে থাকে তাহলে তা বের করে দেওয়া হয়। যেমন উচ্চ রক্তচাপ যা ঔষধ দিয়েও নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, কিডনির সংক্রমণ (pyelonephritis with active infection), পলিসিসটিক কিডনি যদি খুবই বড় হয় এবং পেটের মধ্যে জায়গা না থাকে ইত্যাদি।
  এই অপারেশন সাধারণত তিন থেকে চার ঘন্টা পর্যন্ত চলে।
  অপারেশন পুরো হবার পরে কিডনির গ্রাহকের আগের চিকিৎসার সমস্ত দায়িত্ব নেফ্রোলজিস্ট সামলান।

কিডনি প্রতিস্থাপনের পরের তথ্য

সম্ভাব্য ভয় : কিডনি প্রতিস্থাপনের পর সম্ভাব্য ভয় বা আশঙ্কার মধ্যে নতুন কিডনিকে শরীরের দ্বারা প্রত্যাখ্যান (কিডনি রিজেকশন), সংক্রমণ, অপারেশন সমন্বিত ভয়, ওষুধের বিপরীত প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ।

ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা এবং কিডনি রিজেকশন (প্রত্যাখ্যান) :

কিডনি প্রতিস্থাপন অন্যান্য অপারেশন থেকে ভিন্ন কেন?

সাধারণত রোগীর অন্যান্য অপারেশনের পর কেবলমাত্র সাত থেকে দশ দিনই নির্ধারিত ওষুধ সেবন করতে হয়। কিন্তু কিডনি প্রতিস্থাপনের অপারেশন-এর

(কিডনি প্রতিস্থাপনের সময় পুরানো কিডনিকে যথাযথ অবস্থায় রেখে নতুন কিডনিকে পেটের সামনের দিকে নীচের অংশে রাখা হয়।)

পরে কিডনি রিজেকশন প্রতিরোধ করার জন্য সারা জীবন নিয়মিত ওষুধ সেবন করতে হয়।

কিডনি রিজেকশন কী?

আমরা জানি যে, সংক্রমণের সময় শরীরে শ্বেতরক্তকণিকাতে রোগ প্রতিরোধক পদার্থ (অ্যান্টিবডি) প্রস্তুত হয়। এই অ্যান্টিবডি জীবাণুর সঙ্গে সংঘর্ষ করে তাদের নষ্ট করে থাকে।

একইভাবে নতুন লাগানো কিডনি বাইরের এন্টিজেন হবার কারণে, রোগীর শরীরের শ্বেতরক্তকণা দ্বারা প্রস্তুত অ্যান্টিবডি এই কিডনির ক্ষতি করতে পারে। এই ক্ষতির মাত্রা অনুযায়ী নতুন কিডনি খারাপ হয়। এই প্রক্রিয়াকেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষাতে রিজেকশন বলে।

কিডনি প্রতিস্থাপনের পরে রিজেকশন-এর সম্ভাবনা কম করার জন্য কোনও প্রকারের ওষুধ উপকারী?

- শরীরের প্রতিরোধ শক্তির কারণে নতুন লাগানো কিডনির প্রত্যাখ্যান (রিজেকশন) হবার সম্ভাবনা থাকে।
- যদি ওষুধ সেবনের দ্বারা শরীরের প্রাকৃতিক প্রতিরোধ শক্তি কমে যায় তাহলে রিজকেশন ভয় থাকে না কিন্তু রোগীর মারাত্মক সংক্রমণ হবার ভয় থেকে যায়।
- কিডনি প্রতিস্থাপনের পরে বিশেষ প্রকারের ওষুধের ব্যবহার করা হয়, যা কিডনি রিজেকশন এক প্রতিরোধ করার মুখ্য কাজ করে এবং রোগের সঙ্গে লড়ার ক্ষমতা বজায় রাখে (Selective Immuno Suppression)
- এই ধরনের ওষুধকে ইমউনোসাপ্রেসেন্ট (Immuno suppresant) বলা হয়। প্রেডনিসোলোন, এজাথায়োপ্রিন, সাইক্লোস্পোরিন, এম. এম. এফ এবং ট্যাক্রোলিমাস হল এই প্রকারের মুখ্য ওষুধ।

কিডনি প্রতিস্থাপনের পরে ইমিউনোসাপ্রেসান্ট ওষুধ কতদিন পর্যন্ত সেবন করা দরকার?

অত্যধিক দামি এইসব ওষুধ কিডনি প্রতিস্থাপনের পরে রোগীদের সর্বদা আজীবন সেবন করতে হয়। শুরুতে ওষুধের মাত্রা (এবং খরচ) বেশি প্রয়োজন হয়, যা সময়ের সাথে ধীরে ধীরে কম হয়ে যায়।

কিডনি প্রতিস্থাপনের পরে মুখ্য ভয়ের আশঙ্কার মধ্যে কিডনি রিজেকশন, সংক্রমণ এবং ওষুধের বিপরীত প্রক্রিয়া অন্যতম।

কিডনি প্রতিস্থাপনের পরে অন্যান্য আর কী কী ওষুধের দরকার পড়ে?
প্রয়োজন অনুসারে কিডনি প্রতিস্থাপন করানোর পরে রোগীর উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ইত্যাদি ওষুধের দরকার হয়।

অন্য কোনও রোগের জন্য যদি ওষুধ সেবনের দরকার পড়ে তাহলে নতুন ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে ওষুধ নেবার আগে তাঁকে জানানো দরকার যে রোগীর কিডনি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে এবং বর্তমানে কী কী ওষুধ চলছে।

কিডনি প্রতিস্থাপনের পরের তথ্য

নতুন কিডনি দেখাশুনা করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য :

কিডনি প্রতিস্থাপনের পরে কিডনির গ্রাহকরোগীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ সূচনা :

- ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিয়মিতরূপে ওষুধ সেবন অত্যন্ত জরুরি যদি ওষুধ অনিয়মিতরূপে সেবন করা হয় তাহলে নতুন কিডনি খারাপ হবার আশঙ্কা থাকে।
- প্রারম্ভে রোগীর ব্লাড প্রেসার, প্রস্রাবের মাত্রা, এবং শারীরিক ওজন নিয়মিতরূপে মেপে তা একটি ডায়েরিতে লিখে রাখা দরকার।
- ডাক্তারবাবুর পরামর্শ মতো ল্যাবরেটরিতে গিয়ে পরীক্ষা করানো দরকার এবং নেফ্রোলজিস্ট দ্বারা নিয়মিত চেক আপ করানো দরকার।
- রক্ত এবং প্রস্রাবের পরীক্ষা কোনও বিশ্বস্ত ল্যাবরেটরি থেকেই করানো দরকার। রিপোর্টে যদি কোনও বড় পরিবর্তন লক্ষ করা যায় তাহলে ল্যাবরেটরি না বদলে শীঘ্র নেফ্রোলজিস্টকে জানানো দরকার।
- যদি জ্বর আসে, পেটের যন্ত্রণা হয়, প্রস্রাব কম আসে, হঠাৎ শরীরের ওজন বৃদ্ধি বা অন্য কোনও অসুবিধা হয়, তাহলে তা শীঘ্র নেফ্রোলজিস্টকে জানানো দরকার।

কিডনি প্রতিস্থাপনের পরে সংক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য সূচনা :

- শুরুতে সংক্রমণের থেকে বাঁচাবার জন্য স্বচ্ছ, জীবাণুরহিত মাস্ক পরা দরকার, যা রোজ বদলানো দরকার।
- প্রতিদিন পরিষ্কার জলে স্নান করার পরে, রোদে গা হাত পা শুকনো দরকার, ইস্ত্রি করা পরিষ্কার জামাকাপড় পরা দরকার।

রিজেকশন প্রতিরোধ করার জন্য কিডনি প্রতিস্থাপনের পরে আজীবন ওষুধ সেবন আবশ্যক

- বাড়ি ঘরকে পুরোপুরি পরিষ্কার রাখা দরকার।
- রোগীর থেকে দূরে থাকা দরকার। ভিড়, দূষণমুক্ত জায়গা যেমন মেলা ইত্যাদি জায়গায় যাওয়া উচিত নয়।
- সর্বদা ছাঁকা এবং ফোটানোর পর ঠাণ্ডা করা জল/ফিল্টার করা জল খাওয়া দরকার।
- বাইরে ভোজন করা উচিত নয়। ইনফেকটেড খাবার খাওয়া উচিত নয়।
- বাড়িতে তৈরি তাজা খাবার পরিষ্কার পাত্রেই খাওয়া দরকার।
- খাদ্য পানীয়র ব্যাপারে সমস্ত পরামর্শ পুরোপুরি পালন করা দরকার।

কিডনি প্রতিস্থাপনের সীমিত উপযোগ :

ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের সমস্ত রোগী কী কারণে, কিডনি প্রতিস্থাপন করাতে পারেন না? কিডনি প্রতিস্থাপন একটি কার্যকর, ফলপ্রসূ চিকিৎসা। তথাপি বেশ কিছু রোগী এই চিকিৎসার সুযোগ নিতে পারেন না। এর মুখ্য কারণ দুটি—

কিডনি উপলব্ধ না থাকা :

১. কিডনি প্রতিস্থাপনে ইচ্ছুক রোগীদের পারিবারিক সদস্যদের মধ্যে যোগ্য কিডনিদাতা বা ক্যাডাভার কিডনি না পাওয়া। এটি কিডনি প্রতিস্থাপনের সীমিত উপযোগের মুখ্য কারণ।

2. ব্যয়বহুল চিকিৎসা :

বর্তমানে কিডনি প্রতিস্থাপনের পুরো খরচ যার মধ্যে অপারেশন, পরীক্ষা, নিরীক্ষা, ওষুধ এবং হাসপাতালের খরচ যুক্ত থাকে, তা প্রায় দুই থেকে পাঁচ লাখ টাকার মধ্যে হয়। হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে যাবার পরে ওষুধ এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার খরচও অনেক বেশি। প্রথম বছরে এইসব খরচ প্রায় দশ থেকে পনেরো হাজার টাকা প্রতিমাসে হয়। প্রথম বছরের পরে এই খরচ কম হতে থাকে। তথাপি জীবনভর ওষুধ সেবন করতে হয়। এইভাবে, কিডনি প্রতিস্থাপনের অপারেশন এবং তার পরের আনুষঙ্গিক খরচ হৃদযন্ত্রের বাইপাস সার্জারির থেকেও বেশি হয়। এত বেশি খরচের কারণে অনেক রোগী কিডনি প্রতিস্থাপন করতে পারে না।

কিডনি প্রতিস্থাপনের পরে সফলতার জন্য নিয়মানুবর্তিতা এবং সাবধানতা খুবই দরকার।

ক্যাডাভার কিডনি প্রতিস্থাপন (Cadevar Kidney Transplanta-tion)

ক্যাডাভার কিডনি প্রতিস্থাপন কী?

ব্রেন ডেথ—মানসিক মৃত (Brain Death) ব্যক্তির শরীর থেকে সুস্থ কিডনি বের করে ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের রোগীর শরীরে লাগানোর অপারেশনকে ক্যাডাভার কিডনি প্রতিস্থাপন বলে।

ক্যাডাভার কিডনি প্রতিস্থাপন দরকারি কেন?

যে কোনও ব্যক্তির কিডনিযুগল ফেল হয়ে যাবার পরে চিকিৎসার কেবল মাত্র দুটিই বিকল্প থাকে—ডায়ালিসিস এবং কিডনি প্রতিস্থাপন।

সফল কিডনি প্রতিস্থাপনের দ্বারা রোগী সাধারণ মানুষের মতো বাঁচার সুযোগ পান। এর দ্বারা রোগীর জীবনযাত্রার মানও উন্নত হয়। এই কারণেই কিডনি প্রতিস্থাপন ডায়ালিসিসের থেকে ভাল চিকৎসাবিকল্প।

কিডনি প্রতিস্থাপনে ইচ্ছুক সমস্ত রোগী নিজের পরিবারের লোকজনের থেকে কিডনি পান না। এই সব রোগীদের জন্য ক্যাডাভার কিডনি প্রতিস্থাপনই হল একমাত্র আশা। মৃত্যুর পরে শরীরের সাথে কিডনিও নষ্ট হয়ে যায়। যদি এই কিডনির সাহায্যে কোনও ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের রোগী নতুন জীবন ফিরে পায় তাহলে তার থেকে ভাল আর কী হতে পারে?

'ব্রেন ডেথ' মানসিক মৃত্যু (Brain Death) কী?

সরল ভাষায় মৃত্যুর অর্থ হল হৃদযন্ত্র, নিঃশ্বাস এবং মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা পুরোপুরি বন্ধ হওয়া। ব্রেন ডেথ ডাক্তার দ্বারা নির্ণয়। ব্রেন ডেথ-এর রোগীদের প্রচণ্ড আঘাতের কারণে মস্তিষ্ক সম্পূর্ণরূপে চিরদিনের জন্য কাজ করা বন্ধ করে দেয়। এই ধরনের রোগীদের কোনও চিকিৎসাতেই জ্ঞান ফেরে না, কিন্তু ভেন্টিলেটর এবং অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমে শ্বাস-প্রশ্বাস এবং হৃদযন্ত্র চালু থাকে এবং শরীরে প্রয়োজনমতো রক্ত পৌঁছায়। এই ধরনের মৃত্যুকেই ব্রেন ডেথ (মানসিক মৃত্যু) বলে।

ব্রেন ডেথ এবং অজ্ঞান হবার মধ্যে কী পার্থক্য?

অজ্ঞান রোগীর মস্তিষ্কের ক্ষতির সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে জ্ঞান ফেরানো সম্ভব।

কিডনি প্রতিস্থাপনের পরে সম্ভাব্য সংক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য সমস্ত রকম সাবধানতা রাখা দরকার।

এই ধরনের রোগীদের সাধারণ চিকিৎসাতেই হৃদযন্ত্র এবং শ্বাস প্রশ্বাস চালু হয় এবং মস্তিষ্ক অন্য সমস্ত কাজ যথাযথভাবে করতে থাকে। এই ধরনের রোগীর চিকিৎসায় পুনরায় সংজ্ঞা ফিরে আসে।

কিন্তু ব্রেন ডেথ-এর ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের এমন গভীর ক্ষতি হয় যে যা ঠিক করা যায় না। এই ধরনের রোগীদের ভেন্টিলেটর বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গেই রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস এবং হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে যায় এবং রোগীর মৃত্যু হয়।

কোনও মানুষ কি মৃত্যুর পরে কিডনি দান করতে পারে?

না, মৃত্যুর পর চক্ষুদানের মতো কিডনি দান করা যায় না। হৃদযন্ত্র বন্ধ হতেই, কিডনিতে রক্ত পৌঁছনো বন্ধ হয়ে যায় এবং কিডনি কাজ করা বন্ধ করে দেয়। এজন্য সাধারণত, মৃত্যুর পর কিডনির উপযোগ করা যায় না।

ব্রেন স্টেম অকেজো হবার কারণে ব্রেন ডেথ হয়—

সাধারণত নিম্নলিখিত কারণে ব্রেন ডেথ হয়—

- দুর্ঘটনার ফলে মস্তিষ্কে গুরুতর আঘাত লাগা।
- রক্তচাপ বাড়া অথবা ধমনী ফাটার ফলে ব্রেন হেমারেজ হওয়া।
- মস্তিষ্কে রক্ত পৌঁছনোর ধমনীতে রক্ত জমে যাওয়া, যার ফলে মস্তিষ্কে রক্ত পৌঁছানো বন্ধ হয়ে যায় (Brain Infarct)।
- মস্তিষ্কে ক্যান্সার হওয়া, যাতে মস্তিষ্কের গুরুতর ক্ষতি হয়।

'ব্রেন ডেথ' এর নির্ণয় কে কখন কীভাবে করেন?

যখন পর্যাপ্ত সময় বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করা সত্ত্বেও রোগীর মস্তিষ্ক বিন্দুমাত্র কাজ করে না এবং সম্পূর্ণরূপে সংজ্ঞাহীন রোগীর ভেন্টিলেটর দ্বারা চিকিৎসা চালু থাকে, তখন রোগীর ব্রেন-ডেথ হবার পরীক্ষা করা হয়। কিডনি প্রতিস্থাপনের ডাক্তারের টিম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ডাক্তারের টিম দ্বারা ব্রেন ডেথের নির্ণয় করা হয়। এই ডাক্তারের টিমে ফিজিসিয়ান, নিউরো ফিজিসিয়ান এবং নিউরো সার্জেন ইত্যাদি থাকেন।

জরুরি ডাক্তারি পরীক্ষা, বিভিন্ন ল্যাবরেটরির পরীক্ষার রিপোর্ট মস্তিষ্কের বিশেষ পরীক্ষা ই. ই. জি তথা অন্যান্য জরুরি পরীক্ষার পরে ডাক্তারেরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছন যে রোগীর মস্তিষ্ক পুনরায় কাজ করতে পারবে না তখনই মানসিক মৃত্যুর পরীক্ষা করার পর তার ঘোষণা করা হয়।

কিডনি প্রতিস্থাপনের সীমিত উপযোগের মুখ্য কারণ কিডনি উপলব্ধ না হওয়া এবং ব্যয়বহুল চিকিৎসা।

ক্যাডাভার কিডনি দাতার কী কী রোগ থাকলে ক্যাডাভার কিডনি নেওয়া যায় না?

- যদি সম্ভাব্য কিডনিদাতার রক্তে সংক্রমণের প্রভাব থাকে।
- ক্যান্সারের রোগ থাকলে (মস্তিষ্ক ছাড়া)
- কিডনি কর্মক্ষম না থাকে, অথবা বেশ কিছু সময় ধরে যদি কিডনি কাজ না করে থাকে, বা কিডনিতে কোনও গুরুতর রোগ থাকলে।
- রক্তের রিপোর্টে যদি এড্স অথবা জনডিস (Jaundice)-এর নির্ণয় হয়, যদি দীর্ঘদিন ধরে রক্তচাপ বা ডায়াবিটিসের রোগী থেকে থাকেন।
- যদি বয়স ১০ বছরের কম বা ৭০ বছরের বেশি হয়।

ক্যাডাভারদাতা কোনও কোন অঙ্গ দান করে অন্যান্য রোগীদের সাহায্য করতে পারেন?

- ক্যাডাভারদাতার দুটি কিডনিই দান হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে, যার দ্বারা কিডনি ফেলিওরের দুজন রোগী নতুন জীবন পেতে পারেন।
- কিডনি ছাড়াও ক্যাডাভার দাতা অন্যান্য অঙ্গ যেমন হৃদযন্ত্র, লিভার, প্যানক্রিয়াস, চোখ ইত্যাদি অঙ্গ দান করতে পারেন।

ক্যাডাভার কিডনি প্রতিস্থাপনের কাজে কোনও কোন ব্যক্তির সমাবেশ হয়?

ক্যাডাভার কিডনি প্রতিস্থাপনের সফলতার জন্য টিম ওয়ার্কের দরকার হয় যাতে—

- ক্যাডাভার কিডনি দান করার অনুমতি দেবার জন্য কিডনি দাতার পারিবারিক সদস্য সমূহের অনুমতি দরকার।
- ক্যাডাভার প্রতিস্থাপনের প্রেরণা এবং সূচনা দেবার জন্য প্রতিস্থাপন সমন্বয়কারী দরকার (Transplant Co-ordinator) (Anaesthetist), এবং রোগী যাঁর অধীনে ভর্তি ছিলেন তাঁদের সকলের মিলিত সম্মতি দরকার 'ব্রেন ডেথ' হয়েছে কি না তা সম্মিলিত ভাবে ওঁদের দিয়েই ঠিক হবে। এরপরে বাড়ির লোকেদের সম্মতিক্রমে অপারেশনের প্রক্রিয়া শুরু করা যেতে পারে।
- অপারেশনের আগে ক্রস ম্যাচ (Cross match) ইত্যাদি পরীক্ষা করা দরকার। তারপরে স্বাভাবিকভাবেই অপারেশন হয়।

কিডনি প্রতিস্থাপনের জন্য পারিবারিক কিডনি না পাওয়া গেলে একমাত্র আশার কিরণ হল ক্যাডাভার কিডনি প্রতিস্থাপন।

কিডনি প্রতিস্থাপন কীভাবে করা হয়?

ক্যাডাভার কিডনি প্রতিস্থাপন করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি হল :

- ব্রেন ডেথ এর সঠিক নির্ণয় হওয়া দরকার।
- কিডনি দাতার ল্যাবরেটরি পরীক্ষা এবং কিডনি সম্পূর্ণ সুস্থ কি না তা সুনিশ্চিত করা দরকার।
- কিডনি দানের জন্য কিডনি দাতার পরিবারের লোকজনের অনুমতি নেওয়া দরকার।
- কিডনিদাতার শরীর থেকে কিডনি বের করার অপারেশন শেষ হওয়া পর্যন্ত রোগীর (ভেন্টিলেটর এবং অন্যান্য ব্যবস্থার সাহায্যে) হৃদযন্ত্র এবং শ্বাস-প্রশ্বাস চালু রাখা হয়।
- কিডনি দাতার ব্লাড গ্রুপ এবং টিসুটাইপিং এর মাধ্যমে নির্ণয় করা প্রয়োজন যে, ক্যাডাভার প্রতিস্থাপনে ইচ্ছুক কোনও রোগীর ক্ষেত্রে কিডনি বেশি উপযোগী।
- সমস্ত ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং প্রস্তুতির পরে, কিডনি প্রতিস্থাপনের অপারেশন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ততই ভাল।
- অপারেশন দ্বারা বের করা ক্যাডাভার কিডনি বা পারিবারিক সদস্য প্রাপ্ত কিডনি, এই দুই ক্ষেত্রেই কিডনি প্রতিস্থাপনের প্রক্রিয়া এক রকমের হয়। একজন কিডনিদাতার শরীর থেকে দুটি কিডনি পাওয়া যায়, যার দ্বারা একসাথে দুজন রোগীর ক্যাডাভার কিডনি প্রতিস্থাপন করা যায়।
- প্রতিস্থাপনের আগে, বরফের মধ্যে রাখা কিডনির বরফের ঠাণ্ডা লাগে এবং রক্তসঞ্চালন না হবার জন্য পুষ্টি এবং প্রাণবায়ু পৌঁছয় না। এই অবস্থায় কিডনি ৬ to ২৪ hours রাখা যেতেও পারে।
- এই ধরনের ক্ষতির ফলে, ক্যাডাভার কিডনি প্রতিস্থাপনের পরে কিছু রোগীর ক্ষত্রে নতুন কিডনির কর্মক্ষম হতে অল্প সময় লাগে এবং এরকম অবস্থায় রোগীর ডায়ালিসিসের প্রয়োজন হতে পারে। একে Delayed Graft function বলে এবং এটা 4-6 Weeks চলতে পারে। কোনো কোনও কোনও ক্ষেত্রে কিডনি একদমই কাজ করে না।

ব্রেন ডেথ হবার পরে, কোনও রোগীর, মানসিকভাবে ঠিক হবার কোনও সম্ভাবনা থাকে না।

ক্যাডাভার কিডনিদাতার কী লাভ হয়?

ক্যাডাভার কিডনিদাতা বা তাঁর পরিবারের লোকজন কোনও অর্থ পান না। এই ধরনের কিডনি গ্রাহক রোগীকে কোনও ধনরাশি দিতে হয় না। কিন্তু মৃত্যুর পর কিডনি নষ্ট হয়ে যায়, এর থেকে ভাল একজন কিডনি ফেলিওরের রোগী সেই কিডনি পেলে নতুন জীবন ফিরে পান—যা এককথায় অমূল্য। এই দানের মাধ্যমে একজন পীড়িত এবং দুঃখী রোগীকে সাহায্য করার আনন্দ বা সুখ অনুভব করা যায়, যার মূল্য আর্থিক লাভের থেকে অনেক বেশি।

এইভাবে, একজন মানুষ তার নিজের মৃত্যুর পরে কিছু না হারিয়ে অন্য একজন রোগীকে জীবনদান করতে পারেন, এর থেকে বড় প্রাপ্তি আর কী হতে পারে?

ক্যাডাভার কিডনি প্রতিস্থাপনের সুবিধা কোথায় পাওয়া যায়?

রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার দ্বারা অনুমোদন প্রাপ্ত হাসপাতালেই এই সুবিধা পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের বেশ কিছু বড় শহর যেমন, মুম্বাই, কলকাতা, দিল্লি, চেন্নাই, আমেদাবাদ, ব্যাঙ্গালোর হায়দ্রাবাদ ইত্যাদি জায়গাতে এই সুবিধা পাওয়া যায়।

সরল ভাষাতে ব্রেন-ডেথের অর্থ ভেন্টিলেটারের সাহায্যে মৃতশরীরে নিঃশ্বাস, হৃদযন্ত্র আর রক্তপ্রবাহ চালু রাখা

অধ্যায় ১৫.
ডায়াবিটিস এবং কিডনি

বিশ্বে এবং তার সঙ্গে সমগ্র ভারতবর্ষে, বর্ধিত জনসংখ্যা এবং শহরীকরণের সঙ্গে সঙ্গে ডায়াবিটিস (মধুমেহ) এর রোগীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে। ডায়াবিটিসের রোগীদের ক্রনিক কিডনি ফেলিওর (ডায়াবিটিস নেফ্রোপ্যাথি) এবং প্রস্রাবে সংক্রমণের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

ডায়াবিটিসের কারণ থেকে ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের ব্যাপারে প্রত্যেক রোগীর কী কী জানা দরকার?

১. ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের অনেক কারণের মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল ডায়াবিটিস যা অত্যন্ত চিন্তাজনকভাবে বেড়ে চলেছে।
২. ডায়ালিসিস করাচ্ছেন এমন ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৩৫ থেকে ৪০ জন রোগীর কিডনি খারাপ হবার কারণ হল ডায়াবিটিস।
৩. ডায়াবিটিসের কারণে রোগীর ডায়াবিটিস এবং উচ্চ রক্তচাপ তাড়াতাড়ি নিয়ন্ত্রণে আনা যায় তাহলে, ভয়ঙ্কর রোগ কিডনি ফেলিওরকে প্রতিরোধ করা সম্ভব।
৪. ডায়াবিটিসের কারণে কিডনি খারাপ হওয়া শুরু হবার পর তা চিকিৎসার মাধ্যমে কিছুদিন চলা সম্ভব। কয়েক বছর পরে অবশ্য ডায়ালিসিস এবং কিডনি প্রতিস্থাপনের মতো ব্যয়বহুল এবং কঠিন চিকিৎসা করার দরকার হয়।

ডায়াবিটিসের রোগীদের কিডনি খারাপ হবার সম্ভাবনা কতটা?

ডায়াবিটিসের রোগীদের দুটি আলাদা আলাদাভাবে বিভক্ত করা যেতে পারে :

১. টাইপ-১ অথবা ইনসুলিন ডিপেনডেন্ট ডায়াবিটিস (IDDM–Insulin Dependent Diabetes Mellitus)

সাধারণত কম বয়সে উদ্ভূত এই প্রকারের ডায়াবিটিসের চিকিৎসায় ইনসুলিনের দরকার হয়। এই প্রকারের ডায়াবিটিসে খুব বেশি অর্থাৎ ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ রোগীর কিডনি খারাপ হবার সম্ভাবনা থাকে।

ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের মুখ্য কারণ হল ডায়াবিটিস।

২. টাইপ-২ অথবা নন ইনসুলিন ডিপেনডেন্ট ডায়াবিটিস (NIDDM–Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus)

ডায়াবিটিসের অধিকাংশ রোগী এই ধরনের হয়। বয়স্ক (Adult) রোগীদের মধ্যে এই ধরনের ডায়াবিটিস হবার সম্ভাবনা বেশি হয়, যা মুখ্যত ওষুধের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। এই প্রকারের ডায়াবিটিসের রোগীদের মধ্যে ১০ থেকে ৪০ শতাংশ রোগীদের কিডনি খারাপ হবার সম্ভাবনা থাকে।

ডায়াবিটিস কীভাবে কিডনির ক্ষতি করে?

কিডনিতে সাধারণত প্রত্যেক মিনিটে ১২০০ মি. লি. রক্ত প্রবাহিত হয়ে শোধিত হয়। ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণ না থাকার ফলে, কিডনিতে প্রবাহিত রক্তের মাত্রা ৪০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যায়, যার ফলে কিডনিকে অধিক কাজ করতে হয় এবং যা হানিকারক হয়। যদি দীর্ঘ সময় ধরে কিডনিকে এইরকম ক্ষতির মোকাবিলা করতে হয়, তাহলে রক্তচাপ বেড়ে যায় এবং কিডনির ক্ষতি হয়। কিডনির বিভিন্ন কোষে গ্লুকোজ জমা হয় (Advanced glycation products) যার ফলে কিডনি খারাপ হয়।

উচ্চ রক্তচাপ, ক্ষতিগ্রস্ত কিডনির উপর বোঝা হিসাবে কাজ করে আরও ক্ষতি করে। কিডনির এই ক্ষতির শুরুতে, প্রস্রাবে প্রোটিন আসতে শুরু করে, যা কিডনির ভবিষ্যতের গুরুতর রোগের প্রথম নির্দশন।

এরপরে, শরীর থেকে জল এবং ক্ষারের নিষ্কাশন প্রয়োজনের থেকে কমে যায়, ফলে শরীরে ফোলাভাব লক্ষ করা যায় (শরীরের ওজন বাড়তে থাকে) এবং রক্তচাপ বাড়তে থাকে। কিডনির আরও বেশি ক্ষতি হবার পরে, কিডনির পরিশোধনের ক্ষমতা কমতে থাকে এবং রক্তে ক্রিয়েটিনিন এবং ইউরিয়ার মাত্রা বাড়তে থাকে। এই সময়ের রক্তের পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের নির্ণয় হয়।

ডায়াবিটিস-এর কারণ কিডনির ক্ষতির সম্ভাবনা কখন এবং কোনও কোন রোগীর থাকে?

সাধারণত ডায়াবিটিস হবার সাত থেকে দশ বছর পরই কিডনির ক্ষতি হতে শুরু করে। ডায়াবিটিসে পীড়িত কোনও রোগীর কিডনির ক্ষতি হবে, একটা নির্ণয় করা খুব কঠিন এবং অসম্ভব। নিম্নলিখিত পরিস্থিতিতে কিডনি খারাপ

ডায়ালিসিস করাচ্ছেন এমন প্রতি তিন জন রোগীর মধ্যে একজনের কিডনি খারাপ হবার কারণ হল ডায়াবিটিস।

হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে-

- কম বয়সে ডায়াবিটিস হওয়া।
- দীর্ঘদিন যাবৎ ডায়াবিটিস হওয়া।
- চিকিৎসার শুরু থেকেই ইনসুলিনের প্রয়োজন হওয়া।
- ডায়াবিটিস এবং উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে না থাকা।
- প্রস্রাবে প্রোটিন আসা।
- প্রাথমিক অবস্থায় সুগার নিয়ন্ত্রণ এবং পরে প্রেসার নিয়ন্ত্রণ করলে কিডনি খারাপের সম্ভাবনা কম হয়।
- ডায়াবিটিসের কারণে রোগীর চোখের ক্ষতি (Diabetic Retinopathy)।
- পরিবারে ডায়াবিটিসের কারণে কিডনি ফেলিওর হয়ে থাকলে।

ডায়াবিটিসের কারণে কিডনির ক্ষতির লক্ষণ :

- প্রাথমিক অবস্থায় কিডনির রোগের কোনও লক্ষণ দেখা যায় না। ডাক্তার দ্বারা প্রস্রাবের পরীক্ষার সময় প্রস্রাবে অ্যালবুমিন (প্রোটিন) পাওয়া, কিডনির গুরুতর রোগের প্রাথমিক নিদর্শন।
- ধীরে ধীরে রক্তচাপ বাড়তে থাকে এবং পা এবং মুখমণ্ডলে ফোলাভাব লক্ষ করা যায়।
- ডায়াবিটিসের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ বা ইনসুলিনের ক্রমশই কম মাত্রাতে প্রয়োজন হওয়া।
- প্রথমে যে মাত্রাতে ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে থাকত না, পরে সেই মাত্রাতেই ডায়াবিটিস ভালভাবে নিয়ন্ত্রণে থাকে।
- বার বার রক্তে শর্করার পরিমাণ কম হওয়া।
- কিডনি বেশি খারাপ হলে, কিছু রোগীর ক্ষেত্রে ডায়াবিটিসের ওষুধ না সেবন করেই ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে। এমত অবস্থায় কিছু রোগী ডায়াবিটিস ভাল হয়ে গেছে এই ভেবে খুশি এবং গর্বিত হন, কিন্তু আসলে এটি কিডনি ফেলিওরের চিন্তাজনক নিদর্শন হতে পারে।
- চোখের উপর ডায়াবিটিসের প্রভাবের কারণে, লেজার দ্বারা চিকিৎসা করাতে বাধ্য হয়েছেন এমন প্রতি তিনজন রোগীর মধ্যে একজনের ভবিষ্যতে কিডনি খারাপ হতে দেখা যায়।

প্রস্রাবে প্রোটিন, উচ্চ রক্তচাপ, ফোলাভাব, কিডনির উপর ডায়াবিটিসের প্রভাবের লক্ষণ।

- কিডনি খারাপ হবার সঙ্গে সঙ্গে রক্তে ক্রিয়েটিনিন এবং ইউরিয়ার মাত্রা বাড়তে থাকে। এর সঙ্গে সঙ্গেই ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের লক্ষণ দেখা যায় এবং সময়ের সঙ্গে তা আরও বাড়তে থাকে।

ডায়াবিটিসের প্রভাব থেকে কিডনিকে কীভাবে বাঁচানো সম্ভব?

১. নিয়মিত ডাক্তারের পরামর্শমত চেক-আপ করানো।
২. ডায়াবিটিস এবং হাই ব্লাড প্রেসারের উপর নিয়ন্ত্রণ।
৩. শীঘ্র নির্ণয়ের জন্য সঠিক পরীক্ষা করানো।
৪. অন্যান্য পরামর্শ : নিয়মিত শরীরচর্চা করা, তামাক, বিড়ি, গুটখা পান, সিগারেট এবং অ্যালকোহল সেবন না করা।

কিডনির উপর কিডনির ডায়াবিটিসের প্রভাবের শীঘ্র নির্ণয় কীভাবে করা হয়?

শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি :

প্রস্রাবে মাইক্রোঅ্যালবুমিনইউরিয়ার(Microalbuminuria)পরীক্ষা।

সরল পদ্ধতি :

প্রতি তিনমাসে একবার রক্তচাপ এবং প্রস্রাবে অ্যালবুমিনের পরীক্ষা করানো। এই পদ্ধতি সরল এবং কম খরচের এমন পদ্ধতি যা প্রায় সব জায়গাতেই করানো যায়। কোনও লক্ষণ না থাকা সত্ত্বেও উচ্চ রক্তচাপ এবং প্রস্রাবে প্রোটিনে উপস্থিতি ডায়াবিটিসের কিডনির উপর প্রভাবের সংকেত।

প্রথমিক স্তরে প্রস্রাবে Microalbuminuria/Creatinine এবং পরে রক্তে ক্রিয়েটিনিন বাড়া ডায়াবেটিক কিডনির লক্ষণ।

প্রস্রাবে মাইক্রোঅ্যালবুমিন ইউরিয়ার পরীক্ষা সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি কেন? এই পরীক্ষা কখন এবং কাদের করানো দরকার?

কিডনির উপর ডায়াবিটিসের প্রভাবের সর্বপ্রথম নিদর্শন প্রস্রাবের মাইক্রোঅ্যালবুমিন ইউরিয়ার পরীক্ষা দ্বারা সম্ভব। নির্ণয়ের এইটি সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি কারণ এই অবস্থায় যদি নির্ণয় হয়ে যায় তাহলে, সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে ডায়াবিটিসের কিডনির উপর ক্ষতিকারক প্রভাবকে সমূলে বিনাশ করা সম্ভব।

এই পরীক্ষা টাইপ-১ প্রকারের ডায়াবিটিসের রোগীদের, ডায়াবিটিস নির্ণয়ের পাঁচ বছর পর থেকে বছরে একবার করে করানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। পরন্তু টাইপ-২

রক্তে শর্করার মাত্রা কমে যাওয়া বা ডায়াবিটিস ঠিক হয়ে যাওয়া কিডনি ফেলিওরের নিদর্শন হতে পারে।

প্রকারের ডায়াবিটিসের রোগীদের ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয়ের বছর থেকেই প্রতি বছরে একবার করে করানোর পরামর্শ দেওয়া হয়।

মাইক্রোঅ্যালবুমিন ইউরিয়ার পজিটিভ টেস্ট ডায়াবিটিসের রোগীদের কিডনি সম্পর্কিত রোগের প্রথম নিদর্শন এবং কিডনির সুরক্ষার জন্য উচ্চতর এবং বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজন সংকেত দেয়।

ডায়াবিটিসের কিডনির উপর প্রভাবের চিকিৎসা :

- সর্বদা ডায়াবিটিসের উপর সঠিক নিয়ন্ত্রণ।
- সতর্কতাপূর্বক সর্বদা উচ্চ রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। প্রতিদিন ব্লাডপ্রেসার মেপে তা লিখে রাখা দরকার। কিডনির কার্য ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য রক্তচাপ সর্বদা ১৩০/৮০-এর নীচে থাকা দরকার।
- A.C.E.I. এবং A.R.B. গ্রুপের ওষুধের প্রথম থেকে ব্যবহার করলে তা রক্তচাপ কমানোর সঙ্গে সঙ্গে কিডনির ক্ষতিকে কম করতে সাহায্য করে।
- শরীরের ফোলাভাব কমানোর জন্য ডাইইউরেটিকস ওষুধ সেবন এবং খাবারে লবণ এবং জলের মাত্রা কম রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়।
- যখন রক্তে ইউরিয়া এবং ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা বেড়ে যায় তখন, ক্রনিক কিডনি ফেলিওর সম্বন্ধে যেসব আলোচনা করা হয়েছে। সেসব দরকার হয়।
- কিডনি ফেলিওরের পরে ডায়াবিটিসের ওষুধের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন রক্তে শর্করার মাত্রার উপর নির্ভর করেই করা দরকার, প্রস্রাবের শর্করার মাত্রার উপর নির্ভর করে নয়।
- কিডনি ফেলিওরের পরে সাধারণত ডায়াবিটিসের ওষুধের মাত্রা কম করার উপর দরকার হয়।
- ডায়াবিটিসের জন্য দীর্ঘ সময় প্রভাব করে এমন ওষুধের থেকে অল্প সময় প্রভাব করে এমন ওষুধই পছন্দ করা হয়। খুব ভাল নিয়ন্ত্রণের জন্য বেশির ভাগ রোগীর ক্ষেত্রে ইনসুলিন ব্যবহার করা হয়।
- বাইগুইনাইডস (মেটফরমিন) নামে পরিচিত ওষুধ কিডনি ফেলিওরের রোগীদের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর হবার জন্য, বন্ধ করে দেওয়া হয়।
- কিডনি যখন পুরোপুরি কাজ করা বন্ধ করে দেয় তখন ওষুধ সেবনের পরেও রোগীর কষ্ট বাড়তে থাকে। এই অবস্থায় ডায়ালিসিস বা কিডনি প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন হয়।

প্রস্রাবে মাইক্রোঅ্যালবুমিন ইউরিয়ার পরীক্ষা ডায়াবিটিসের কিডনির উপর ক্ষতিকারক প্রভাবের নির্ণয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি।

অধ্যায় ১৬.
বংশানুক্রমিক রোগ : পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ

বংশানুক্রমিক রোগগুলির মধ্যে পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ (পি. কে. ডি.) সবথেকে বেশি পাওয়া যায়। এই রোগের প্রভাব মুখ্যত কিডনির উপরেই হয়। কিডনিযুগলে বেশি সংখ্যায় সিস্ট (জলের বুদবুদের মতো)-এর সৃষ্টি হয়। ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের কারণগুলির মধ্যে এটিও একটি অন্যতম কারণ। কিডনি ছাড়াও এই ধরনের সিস্ট লিভার, স্প্লিন (Spleen) , (ইনটেস্টাইনে) দেখা যায়। ব্রেনে Ancurysm হয়।

পি. কে. ডি-র বিস্তার :

পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ

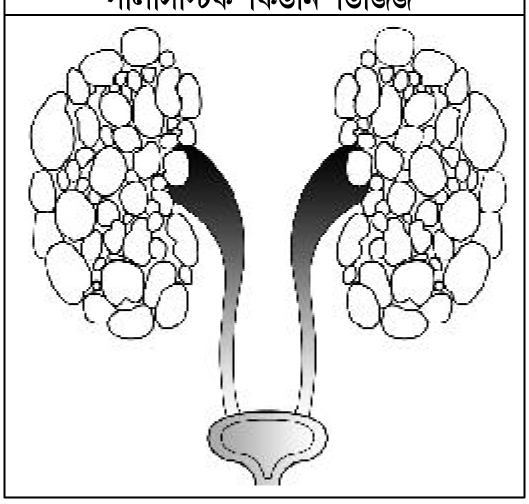

পি. কে. ডি-র স্ত্রী পুরুষ বিভিন্ন জাতি এবং দেশ ভেদে কোনও পরিবর্তন দেখা যায় না। আনুমানিক প্রতি ১০, ০০০ লোকের মধ্যে একজনের এই রোগ দেখা যায়।

পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ রোগ কাদের হতে পারে?

প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে প্রকাশিত পি. কে. ডি রোগ অটোজোমাল ডমিন্যান্ট ধরনের বংশানুক্রমিক রোগ, সেক্ষেত্রে, রোগীর ৫০ শতাংশ অর্থাৎ অর্ধেক সন্তানের মধ্যে এই রোগভোগের সম্ভাবনা থাকে।

পি. কে. ডি. রোগের বিস্তার কেন প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়?

সাধারণত যখন পি. কে. ডি. রোগের নির্ণয় হয়, তখন রোগীর বয়স ৩৫ থেকে ৫৫ বছরের কাছাকাছি হয়, বেশিরভাগ পি. কে. ডি.র রোগীদের এই বয়সের আগেই সন্তানের জন্ম হয়ে গিয়ে থাকে। এই কারণেই পি. কে. ডি.কে ভবিষ্যৎ

প্রজন্মের বিস্তার থেকে রোখা যায় না।

পি. কে. ডি. রোগে কিডনির কী ক্ষতি হয়?

- পি. কে. ডি. তে দুটি কিডনিতেই অসংখ্য বেলুন বা বুদবুদের মতো সিস্ট দেখতে পাওয়া যায়।
- বিভিন্ন আকারের অসংখ্য সিস্টের মধ্যে সব থেকে ছোট আকারের সিস্ট এত ছোট হয় যে তা খালি চোখে দেখা যায় না, আর বড় সিস্ট আকারে দশ সে.মি. বা তার অধিক ব্যাসেরও হতে পারে।
- সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সিস্টগুলির আকারও বাড়তে থাকে যার ফলে, কিডনির আকারও বাড়তে থাকে।
- এই ধরনের বর্ধিত সিস্টের কারণে কিডনির কার্যরত ভাগের উপর চাপ সৃষ্টি হয়, যার ফলে উচ্চ রক্তচাপ হয়, এবং কিডনির কর্মক্ষমতা ক্রমশ কমতে থাকে।
- বেশ কয়েক বছর পরে অনেক রোগীরই দুটি কিডনিই কাজ করা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়।

পি. কে. ডি.-র লক্ষণ কী?

সাধারণত ৩০ থেকে ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত রোগীদের কোনও লক্ষণ দেখা যায় এমন লক্ষণগুলি হল-

- রক্তচাপ বৃদ্ধি পাওয়া।
- পেটের যন্ত্রণা, ব্যথা বা পেট বড় হওয়া।
- প্রস্রাবে রক্ত আসা।
- প্রস্রাবে বার বার সংক্রমণ হওয়া।
- কিডনিতে স্টোন হওয়া।
- রোগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের লক্ষণও দেখা যায়।
- কিডনির ক্যান্সারের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

পি. কে. ডি নির্ণয় হওয়া এমন সমস্ত রোগীরই কি কিডনি ফেল হয়?

না, পি. কে. ডি. নির্ণয় হয়েছে এমন সমস্ত রোগীরই কিডনি খারাপ হয় না। পি. কে. ডির রোগীদের কিডনি ফেলিওর হওয়ার সংখ্যা ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত ৫০ শতাংশ, এবং ৭০ বছর বয়স পর্যন্ত ৬০ শতাংশ হয়ে থাকে।

কিডনির বংশানুক্রমিক রোগগুলির মধ্যে পি. কে. ডি. সব থেকে বেশি দেখা যায়।

পি. কে. ডি নির্ণয় কীভাবে হয়?

১. **কিডনির সোনোগ্রাফি :** সোনোগ্রাফিরার সাহায্যে পি. কে. ডি-র নির্ণয় সহজে এবং কম খরচে করা যায়।

২. **সি. টি. স্ক্যান :** পি. কে. ডি-তে যদি সিস্টের আকার খুব ছোট হয় তাহলে তা সোনোগ্রাফিতে ধরা পড়ে না। এই অবস্থায় পি. কে. ডি-র শীঘ্র নির্ণয় সি. টি. স্ক্যান দ্বারা করা সম্ভব।

৩. **পারিবারিক ইতিহাস :** যদি পরিবারের কোনও সদস্যের পি. কে. ডি-র নির্ণয় হয়, তাহলে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও পি. কে. ডি হবার সম্ভাবনা থাকে।

৪. **প্রস্রাব এবং রক্তের পরীক্ষা :**

- **প্রস্রাবের পরীক্ষা :** প্রস্রাবের সংক্রমণ এবং রক্তের (Leucocytes) (RBC) মাত্রা জানার জন্য
- **রক্তের পরীক্ষা :** রক্তের ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন-এর মাত্রার মাধ্যমে কিডনির কার্যক্ষমতা জানা যায়।

৫. **জেনেটিক্স-এর পরীক্ষা :** শরীরের রচনা এবং কার্যপ্রণালী ক্রোমোজোমের (Chromosome) দ্বারা নির্ধারিত হয়। কিছু ক্রোমোজোমের পরিবর্তনের বা অস্বাভাবিকতার কারণে পি. কে. ডি হয়। ক্রোমোজোমের এইসব অস্বাভাবিকতার অল্প বয়সেই পরীক্ষার মাধ্যমে ভবিষ্যতে পি. কে. ডি হবে কি না তা জানা সম্ভব।

পি. কে. ডি-র কারণে কিডনি ফেলিওর হবার সমস্যাকে কীভাবে কম করা যায়?

পি. কে. ডি একটি বংশানুগতিক রোগ, যা প্রতিরোধ বা ঠিক করার কোনও চিকিৎসা এখনও উপলব্ধ নয়।

যদি পরিবারের কোনও একজন সদস্যের পি. কে. ডি-র নির্ণয় হয় তাহলে বাকি সদস্যদের ডাক্তারবাবুর পরামর্শ মতো সোনোগ্রাফির দ্বারা পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া দরকার।

৪০ বছর বয়সে হওয়া পি. কে. ডি-র মুখ্য লক্ষণ পেটের যন্ত্রণা এবং প্রস্রাবে রক্ত আসা।

পি. কে. ডি. চিকিৎসা :

পি. কে. ডি দুরারোগ্য রোগ। তবুও এই রোগের চিকিৎসা করানোর প্রয়োজন কেন?

এটা ঠিক যে, চিকিৎসার পরেও এই রোগের আরোগ্য হয় না। তথাপি, এই রোগের চিকিৎসা করানোর দরকার, কারণ জরুরি চিকিৎসার মাধ্যমে কিডনিকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব এবং কিডনি খারাপ হবার প্রক্রিয়াকে মন্থর করা সম্ভব।

মুখ্য চিকিৎসা :

- উচ্চ রক্তচাপের নিয়ন্ত্রণে রাখা।
- মূত্রমার্গের সংক্রমণ এবং স্টোনের অসুবিধার শীঘ্র চিকিৎসা করানো দরকার।
- যদি শরীরে ফোলাভাব না থাকে তাহলে অধিক পরিমাণে জল খাওয়া দরকার, যা সংক্রমণ এর স্টোনের সমস্যাকে কম করতে সাহায্য করে।
- পেটের যন্ত্রণা চিকিৎসা কিডনির ক্ষতি পৌঁছায় না এমন ওষুধের দ্বারা করা হয়।
- কিডনি খারাপ হবার পরে ‘‘ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের চিকিৎসা’’ পর্বে চর্চিত চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসারে চিকিৎসা করানো দরকার।

পি. কে. ডি বংশানুক্রমিক রোগ হবার কারণে, পরিবারের বাকি সদস্যদের পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া দরকার।

অধ্যায় ১৭.

কেবলমাত্র একটি কিডনি শরীরে

যে কোনও ব্যক্তির শরীরে যদি একটি মাত্র কিডনি থাকে তাহলে তা স্বাভাবিকভাবেই সেই ব্যক্তির কাছে চিন্তার কারণ।

এই বিভাগে, একটিমাত্র কিডনি থাকার কারণে উদ্ভূত আশঙ্কা বা চিন্তা দূর করার এবং সঠিত তথ্য দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

একটিমাত্র কিডনিযুক্ত ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনে কী কী অসুবিধা হয় এবং কেন?

একটিমাত্র কিডনিযুক্ত ব্যক্তির দৈনন্দিন পরিশ্রমে বা সহবাসে কোনও অসুবিধা হয় না। সাধারণত প্রত্যেক মানুষের শরীরে দুটি কিডনি থাকে। কিন্তু প্রত্যেক কিডনির কার্যক্ষমতা এতটাই হয় যে তা শরীরের সমস্ত জরুরি কাজ একাই করতে সমর্থ।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একটি কিডনিযুক্ত ব্যক্তি সুস্থ স্বাভাবিকভাবেই বাঁচতে পারে। সাধারণত হঠাৎ করেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময়ে শরীরে একটিমাত্র কিডনিই আছে বলে ধরা পড়ে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এদের কিডনি ফেলিওর হওয়ার সম্ভাবনা দুটি কিডনিসম্পন্ন লোকের তুলনায় একটু বেশি।

একটি কিডনি কী থাকার কারণ কী?

একটিমাত্র কিডনি থাকার কারণগুলি হল :

১. জন্ম থেকেই শরীরে একটিমাত্র কিডনি থাকা।

২. অপারেশন দ্বারা শরীর থেকে একটি কিডনি বের করে নেওয়া। অপারেশন দ্বারা একটি কিডনি বের করে নেবার মুখ্য কারণগুলি হল, কিডনি স্টোন, পুঁজ হওয়া বা দীর্ঘ সময় ধরে মূত্রমার্গে অবরোধের কারণে একটি কিডনির কাজ বন্ধ করে দেওয়া বা কিডনিতে ক্যান্সার হওয়া ইত্যাদি।

৩. কিডনি প্রতিস্থাপন করানো এমন রোগীদের শরীরে কেবলমাত্র একটি কিডনিই কার্যরত থাকে।

জন্ম থেকেই কেবলমাত্র একটি কিডনি থাকার সম্ভাবনা কতটা?

একটি কিডনিযুক্ত ব্যক্তির দৈনন্দিন এবং সাধারণ জীবন যাপন করতে কোনও অসুবিধা হয় না।

জন্ম থেকেই শরীরে একটিমাত্র কিডনি থাকার সম্ভাবনা স্ত্রীদের থেকে পুরুষদের মধ্যে বেশি থাকে এবং প্রতি ৭৫০ ব্যক্তির মধ্যে একজনের একটিমাত্র কিডনি থাকার সম্ভাবনা থাকে।

একটিমাত্র কিডনিযুক্ত ব্যক্তিদের কী কী সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার?

সাধারণত একটিমাত্র কিডনিযুক্ত ব্যক্তির কোনও অসুবিধা হয় না কিন্তু এই ধরনের ব্যক্তির তুলনা বিনা স্পেয়ার হুইল (অতিরিক্ত চাকা বা স্টেপনি) যুক্ত গাড়ির সঙ্গে করা যেতে পারে। যদি একমাত্র কার্যরত কিডনির কোনও ক্ষতি হয় তাহলে শরীরের কাজকর্ম পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। যদি এই কিডনি অল্প সময়ের মধ্যে কাজ করতে শুরু না করে তাহলে, শরীরের উপর এর হানিকারক প্রভাব পড়ে, যা পরে মৃত্যুর কারণ পর্যন্ত হতে পারে। এইরকম ব্যক্তির শীঘ্র ডায়ালিসিসের দরকার পড়তে পারে।

সুস্থ ব্যক্তির একটিমাত্র কিডনি ক্ষতি হবার সম্ভাবনা কখন থাকে?

১. একমাত্র কিডনির মূত্রমার্গে পাথরের কারণে অবরোধ হওয়া।
২. পেটের কোনও অপারেশনের সময় কিডনি থেকে মূত্রবহনকারী নালীকে ভুল করে বেঁধে দেওয়া হলে।
৩. কিডনি দাতা যিনি একটি কিডনি দান করেছেন।
৪. কুস্তি, বক্সিং, ক্যারাটে, ফুটবল, হকি বা দুর্ঘটনার কারণে একটি কিডনির অকস্মাৎ ক্ষতি।

একটিমাত্র কিডনিযুক্ত ব্যক্তি নিম্নলিখিত সতর্কতাগুলি অবলম্বন করবেন :

১. অধিকমাত্রায় জল খাওয়া দরকার।
২. কিডনিতে আঘাত লাগতে পারে এমন সব খেলাতে অংশগ্রহণ করা উচিত নয়।
৩. প্রস্রাবে সংক্রমণ বা স্টোন হলে শীঘ্র তার চিকিৎসা করানো দরকার।
৪. বিনা ডাক্তারের পরামর্শে ওষুধ সেবন না করা।
৫. প্রতি বছর একবার ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়ে ব্লাড প্রেসার মাপানো দরকার এবং ডাক্তারবাবুর পরামর্শমতো রক্ত এবং প্রস্রাবের পরীক্ষা ও সোনোগ্রাফি করানো দরকার। কোনো ধরনের চিকিৎসা বা অপারেশন করানোর পূর্বে শরীরে একটি কিডনি আছে এই তথ্য ডাক্তারবাবুকে দেওয়া দরকার।

একটি কিডনিযুক্ত ব্যক্তির চিন্তা করা উচিত নয়,
কিন্তু সতর্ক বা সাধারণ থাকা দরকার।

অধ্যায় ১৮.
কিডনি ও উচ্চ রক্তচাপ

সাধারণত প্রাপ্তবয়স্কদের রক্তচাপ ১৩০/৮০ হয়। যখন রক্তচাপ ১৪০/৯০ এর বেশি হয়, তখন তাকে উচ্চ রক্তচাপ বা হাই ব্লাডপ্রেসার বলে।

কী কারণে রক্তচাপ বাড়ে এবং তার চিকিৎসা দরকার কেন?

- উচ্চ রক্তচাপ ৩৫ বছরের বেশি বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যেই বেশিরভাগ দেখা যায়। এই ধরনের অধিকাংশ রোগীদের উচ্চ রক্তচাপের কারণ বংশানুক্রমিক। ইহাকে Primary বা Essential Hypertension ও বলা হয়।
- উচ্চ রক্তচাপের ১০ শতাংশ রোগীদের উচ্চ রক্তচাপের কারণ অন্য কোনও রোগ, যাকে Secondary Hypertension বলে।
- উচ্চ রক্তচাপের সময়ে চিকিৎসার দ্বারা হৃদয়, মস্তিষ্ক, কিডনির মতো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব।

কোন কোন রোগের কারণে রক্তচাপ বাড়ে? অর্থাৎ Secondary Hypertension-এর কারণ কী?

উচ্চ রক্তচাপের কেবলমাত্র ১০ শতাংশ রোগীদের ক্ষেত্রেই কোনও না কোনও রোগ কারণস্বরূপ থাকে, যাদের বর্ণনা নিচে দেওয়া হল। এইসব রোগীদের মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ৯০ শতাংশ রোগীদের ক্ষেত্রে কারণ হল কিডনির রোগ।

১. কিডনির রোগ
২. কিডনিতে রক্ত সংবহনকারী মুখ্য ধমনীর সংকোচন (Renal Artery Stenosis)
৩. কিডনিতে অবস্থিত অ্যাড্রিনাল গ্রন্থিতে গাঁটের উপস্থিতি (Pheochromocytoma)
৪. শরীরের নীচের অংশে রক্ত সংবহনকারী মহাধমনীর সংকোচন (Coractation of Aorta)
৫. স্টেরয়েড এর মতো ওষুধের খারাপ প্রভাব।

কিডনির কোন কোন রোগের কারণে উচ্চ রক্তচাপ হতে পারে?

ছোট শিশু উচ্চ রক্তচাপের জন্য অ্যাকিউট গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস (কিডনি ফুলে

কম বয়সে উচ্চ রক্তচাপ হওয়া কিডনির রোগের সংকেত হতে পারে।

যাওয়া), ক্রনিক গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস এবং জন্ম থেকে মূত্রমার্গের রোগ (Vesico Ureteric reflux) ইত্যাদিও প্রধান কারণ।

প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপের কারণস্বরূপ কিডনির রোগগুলি হল, ডায়াবিটিক নেফ্রোপ্যাথি (ডায়াবিটিসের কারণে কিডনির ক্ষতি), ক্রনিক গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস, পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ, কিডনিতে রক্ত সংবহনকারী ধমনীর সংকোচন ইত্যাদি।

কোন পরিস্থিতিতে কিডনির কারণে উচ্চ রক্তচাপ হবার সম্ভাবনা থাকে?

নিম্নলিখিত কারণের উপস্থিতিতে কিডনির কারণে উচ্চ রক্তচাপ হবার সম্ভাবনা অধিক থাকে-

১. ৩০ বছরের কম বয়সে উচ্চ রক্তচাপ হওয়া।

২. উচ্চ রক্তচাপের নির্ণয়ের সময় রক্তচাপ অত্যধিক যেমন ২০০/১২০ এর থেকে বেশি হওয়া।

৩. রক্তচাপ অত্যধিক থাকা এবং ওষুধ সেবন সত্ত্বেও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে না আসা।

৪. উচ্চ রক্তচাপের কারণে চোখের উপর প্রভাব এবং দৃষ্টিতে অসুবিধা।

৫. উচ্চ রক্তচাপের সাথে, সকালে মুখমণ্ডল ফুলে যাওয়া, শারীরিক দুর্বলতা, ক্ষুধামান্দ্য, ইত্যাদি কিডনির রোগের সংকেত হতে পারে।

উচ্চরক্তচাপের রোগীদের কিডনির রোগের নির্ণয় কীভাবে করা হয়?

সাধারণত প্রস্রাবের পরীক্ষা, রক্তের ক্রিয়েটিনিনের পরীক্ষা, পেটের এক্স-রে এবং কিডনির সোনোগ্রাফি পরীক্ষার দ্বারা কিডনির রোগের প্রাথমিক নির্ণয় করা হয়। এরপরে ইনট্রাভেনাস পাইলোগ্রাফি, কালার ডপলার স্টাডি এবং রেনাল অ্যানজিওগ্রাফি ইত্যাদি পরীক্ষার মাধ্যমে প্রয়োজন অনুসারে নির্ণয় করা হয়। এইভাবে, ঠিক কী কারণে উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে তা নির্ণয় করা হয় এবং তার সঠিক চিকিৎসা সুনিশ্চিত করা হয়।

উচ্চরক্তচাপের কারণস্বরূপ কিডনির রোগের নির্ণয় করা আবশ্যক কেন?

উচ্চরক্তচাপ কিডনির রোগের কারণেই হয়, এই রোগের শীঘ্র নির্ণয় হওয়া দরকার। এর লাভগুলি হল নিম্নলিখিত :

১. কিডনির বেশ কিছু রোগ শীঘ্র নির্ণয় এবং চিকিৎসায় পুরোপুরি ঠিক হয়ে যায়।

প্রাথমিক নির্ণয়ের সময় রক্তচাপ অত্যধিক হবার মুখ্য কারণ হল কিডনির রোগ।

২. কিডনির রোগের প্রকার ও ধরনের উপর ভিত্তি করে যোগ্য এবং প্রভাবশালী চিকিৎসা করা যেতে পারে।
৩. শিশুদের কিডনির এক ধরনের রোগে (Acute Glomerulonephritis) অতি শীঘ্র এবং অত্যধিক রক্তচাপ বাড়তে থাকে, যার খারাপ প্রভাব মস্তিষ্কের উপর পড়তে পারে এবং শিশু অজ্ঞানও হতে পারে। এই উচ্চরক্তচাপের যথাসময়ে এবং যথাযোগ্য চিকিৎসার দ্বারা শিশুকে এই গভীর রোগ থেকে বাঁচানো সম্ভব।
৪. উচ্চরক্তচাপ ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের মতো ভয়ঙ্কর রোগের প্রথম এবং একমাত্র নিদর্শন হতে পারে। ক্রনিক কিডনি ফেলিওরে উচ্চরক্তচাপের উপর নিয়ন্ত্রণ এবং জরুরি চিকিৎসার মাধ্যমে কিডনিকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব। এইভাবে ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের অন্তিম পর্যায়ের প্রয়োজনীয় ডায়ালিসিসেরই চিকিৎসাকে দীর্ঘসময় পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব।

চিকিৎসা :

কিডনির কারণে উদ্ভূত উচ্চরক্তচাপের চিকিৎসা রোগের প্রকারের উপর নির্ভর করে।

১. অল্প সময়ের জন্য বর্ধিত উচ্চরক্তচাপের চিকিৎসা :
মুখ্যত শিশুদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় এমন রোগ অ্যাকিউট গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস-এর ক্ষেত্রে খাদ্যে তরল বা লবণের মাত্রা কমিয়ে, প্রস্রাবের মাত্রা বাড়ানোর ওষুধ এবং রক্ত চাপ কমানোর ওষুধ সেবনের মাধ্যমে রক্তচাপ ধীরে ধীরে কমে যায় এবং তার পরে চিকিৎসার কোনও প্রয়োজন হয় না।

২. সর্বদা বজায় থাকা উচ্চরক্তচাপের চিকিৎসা :

- **ক্রনিক কিডনি ফেলিওর :** এই রোগের কারণে উদ্ভূত রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য খাদ্যে লবণের মাত্রা কম করা দরকার, শরীরের ফোলাভাবের কথা মাথায় রেখে পরামর্শমতো জলপান করা দরকার এবং রক্তচাপ কম করার জন্য সঠিক ওষুধ খাওয়া দরকার। এই ধরনের রোগীদের উচ্চরক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখলে কিডনিকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব।
- **রেনাল আর্টারি স্টেনোসিস (Renal Artery Stenosis) :** যদি কিডনিতে

কিডনির রোগের প্রাথমিক নির্ণয়ের জন্য প্রস্রাব, রক্ত, ক্রিয়েটিনিন এবং সোনোগ্রাফির পরীক্ষা করানোর দরকার।

রক্ত সংবহনকারী ধমনীর সংকোচনের ফলে রক্তচাপ বেশি থাকে, তাহলে তা শীঘ্র ও তৎক্ষণাৎ চিকিৎসার মাধ্যমে পুরোপুরি স্বাভাবিক করা সম্ভব। এই চিকিৎসার জন্য নিম্নলিখিত বিকল্পগুলি সম্ভব-

১. **রেনাল অ্যানজিওপ্লাস্টি (Renal Angioplasty) :** এই চিকিৎসায়, বিনা অপারেশনে, ক্যাথিটার (বিশেষ ধরনের নালী) দ্বারা সংকোচিত অংশটি ক্যাথিটারে লাগানো বেলুনের সাহায্যে ফোলানো হয়। অধিকাংশ রোগীদের সংকুচিত অংশ ফোলানোর পরে যেন আর সংকুচিত না হয় সেজন্য ধমনীর ভিতর সেন্ট (বিশেষ ধরনের পাতলা নালী) রাখা হয়।

২. **অপারেশন দ্বারা চিকিৎসা (Auto Transplant) :** এই চিকিৎসাতে অপারেশন করে ধমনীর সংকুচিত অংশ বদলে দেওয়া হয় অথবা রোগীর কিডনিকে অন্য জায়গায় রক্তের নালীর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। (কিডনি প্রতিস্থাপনের মতো)

ক্রনিক কিডনি ফেলিওরে উচ্চরক্তচাপের উচিত নিয়ন্ত্রণ কিডনির সুরক্ষার জন্য আবশ্যিক।

অধ্যায় ১৯.
মূত্রমার্গের সংক্রমণ

কিডনি, মূত্রবাহিনী, মূত্রাশয় এবং মূত্রনালিকার দ্বারা মূত্রমার্গের সংগঠন হয়, যাতে ব্যাকটিরিয়া দ্বারা সংক্রমণকে মূত্রমার্গের সংক্রমণ (Urinal Tract Infection বা UTI) বলে।

মূত্রমার্গের সংক্রমণের লক্ষণ কী?

মূত্রমার্গের বিভিন্ন অংশে সংক্রমণের প্রভাবের লক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন হয়। এই লক্ষণ সংক্রমণের মাত্রা অনুসারে কম বা বেশি দেখা যায়। অধিকাংশ রোগীদের মধ্যে দেখতে পাওয়া লক্ষণগুলি -

- প্রস্রাবের সময় জ্বলন বা যন্ত্রণা হওয়া।
- বার বার প্রস্রাব হওয়া বা প্রস্রাব ফোঁটা ফোঁটা হওয়া।
- জ্বর আসা।

মূত্রাশয়ে সংক্রমণের লক্ষণ :

- তলপেটের যন্ত্রণা
- লাল রং-এর প্রস্রাব হওয়া।

কিডনিতে সংক্রমণের লক্ষণ :

- কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসা।
- কোমরে যন্ত্রণা হওয়া বা দুর্বলতা অনুভূত হওয়া।
- যদি সঠিক চিকিৎসা না হয় তাহলে এই রোগ মৃত্যুর কারণ পর্যন্ত হতে পারে।

বার বার মূত্রমার্গে সংক্রমণ হওয়া বা সঠিক চিকিৎসার পরেও সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে না আসার কারণগুলি হল :

১. মহিলাদের মূত্রপালিকা ছোট হবার কারণে মূত্রাশয়ের কারণে সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি থাকে।
২. ডায়াবিটিসের কারণে রক্তে এবং প্রস্রাবে শর্করার (গ্লুকোজ) মাত্রা বেশি থাকার

জ্বলন-এর সঙ্গে বার বার প্রস্রাব হওয়া, মূত্রমার্গের সংক্রমণের লক্ষণ।

কারণে।

৩. বয়সকালে কিছু পুরুষের প্রস্টেট গ্রন্থি বড় হবার কারণে প্রস্রাব করতে অসুবিধা হয় বা বয়স্কা মহিলাদের মূত্রনালিকা সংকোচনের কারণে প্রস্রাব করতে অসুবিধা হয় এবং মূত্রাশয় পুরোপুরি খালি হয় না।

৪. মূত্রমার্গের পাথর হওয়া।

৫. মূত্রমার্গে অবরোধ হওয়া : মূত্রনালিকার সংকোচন (Stricture Urethra) অথবা কিডনি বা মূত্রবাহিনীর মধ্যের অংশের সংকোচন (Pelviureteric Junction Obstruction)

৬. অন্যান্য কারণ : মূত্রাশয়ের স্বাভাবিক কার্যপ্রক্রিয়ার কমতি (Neurogenic Bladder), জন্ম থেকেই মূত্রমার্গের ক্ষতি যার ফলে প্রস্রাব মূত্রাশয় থেকে মূত্রবাহিনীতে উল্টোপথে আসে(Vesico Ureteric Reflux), মূত্রমার্গে যক্ষ্মা (টি.বি) এর প্রভাব।

মূত্রমার্গের বারবার সংক্রমণের ফলে কি কিডনির কোনও ক্ষতি হতে পারে?

সাধারণত শৈশবের মূত্রমার্গের বারবার সংক্রমণের পরেও কিডনির ক্ষতি হয় না। কিন্তু মূত্রমার্গে পাথর, অবরোধ, ক্ষয়রোগ ইত্যাদি রোগের উপস্থিতিতে মূত্রমার্গের সংক্রমণ হলে কিডনির ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে।

শিশুদের মূত্রমার্গের সংক্রমণের চিকিৎসা যদি সঠিক সময়ে না করানো হয় তাহলে কিডনির অপূরণীয় ক্ষতি হতে পারে। এই কারণে মূত্রমার্গের সমস্যা অন্য বয়সের তুলনায় শিশুদের ক্ষেত্রে বেশি চিন্তার কারণ।

মূত্রমার্গে সংক্রমণের নির্ণয় :

- **প্রস্রাবের সাধারণ পরীক্ষা :** প্রস্রাবের মাইক্রোস্কোপিক পরীক্ষাতে পুঁজের উপস্থিতি (Pus cell), মূত্রমার্গে সংক্রমণের সূচক।

- **প্রস্রাবের কালচার এবং সেনসিটিভিটির পরীক্ষা :** প্রস্রাবের কালচার এবং সেনসিটিভিটি পরীক্ষা সংক্রমণের কারণস্বরূপ ব্যাকটিরিয়ার প্রকার এবং তার চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধের ব্যাপারে বিশদ তথ্য দেয়।

- **অন্যান্য পরীক্ষা :** রক্তের পরীক্ষাতে, রক্তে উপস্থিত অত্যধিক শ্বেতকণিকার মাত্রা সংক্রমণের গভীরতা দর্শায়।

মূত্রমার্গের অবরোধ প্রস্রাবে বারবার সংক্রমণের মুখ্য কারণ

মূত্রমার্গে সংক্রমণ বারবার হবার কারণের নির্ণয় কীভাবে করা হয়?

প্রস্রাবে বারবার পুঁজের উপস্থিতি এবং সংক্রমণের চিকিৎসা ফলপ্রসূ না হবার কারণের নির্ণয় নিম্নলিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে করা হয় :

১. পেটের এক্স-রে এবং সোনোগ্রাফি।
২. ইন্ট্রাভেনাস পাইরোগ্রাফি (IVP)
৩. মিকটিউরেটিং সিস্টোইরেথ্রোগ্রাম (MCU)
৪. প্রস্রাবে টি.বি.র জীবাণুর পরীক্ষা (Urinary AFB)
৫. ইউরোলোজিস্ট দ্বারা বিশেষ প্রকার দূরবিনের সাহায্যে মূত্রনালিকা এবং মূত্রাশয়ের ভিতরের ভাগের পরীক্ষা (Cystoscopy)
৬. স্ত্রী-রোগ বিশেষজ্ঞ (Gynaecologist) দ্বারা পরীক্ষা এবং নির্ণয়।

মূত্রমার্গের সংক্রমণের চিকিৎসা :

১. **অধিক জলপান :** প্রস্রাবের সংক্রমণের রোগীদের অধিক মাত্রায় জলপান করার বিশেষ পরামর্শ দেওয়া হয়। কিডনিতে সংক্রমণের কারণে কিছু রোগীর অত্যধিক বমি হয়, তাদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করে গ্লুকোজের বোতল চড়ানোর প্রয়োজনও পড়তে পারে।

২. **ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা :** মূত্রাশয়ের সংক্রমণের রোগীদের সাধারণত ক্লোটাইমেক্সোজোল, সেফালোস্পোরিন অথবা কুইনোলোন্স গ্রুপের ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা করা হয়। এইসব সাধারণত সাত দিনের জন্য দেওয়া হয়। যেসব রোগীদের কিডনির সংক্রমণ খুবই গুরুতর হয় (অ্যাকিউট পাইলোনেফ্রাইটিস), তাদের শুরু থেকেই ইনজেকশন দ্বারা অ্যান্টিবায়োটিকস দেওয়া হয়। সাধারণত সোফালোস্পোরিনস, মিইনোলোন্স, অ্যাবিনোগ্লাসকোসাইডস গ্রুপের ইনজেকশন এইধরনের চিকিৎসাতে ব্যবহার করা হয়।

   প্রস্রাবে কালচার রিপোর্টের সাহয্যে অধিক প্রভাবশালী ওষুধ বা ইনজেকশন নির্বাচন করা হয়। শারীরিক অবস্থার উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও এই চিকিৎসা ১৪ দিন পর্যন্ত চালু রাখা হয়। চিকিৎসার পরে পরীক্ষার মাধ্যমে, চিকিৎসাতে কি উন্নতি হয়েছে তা জানা যায়। ওষুধ পুরো হবার পরে, প্রস্রাবে পুঁজের অনুপস্থিতি, সংক্রমণের উপর নিয়ন্ত্রনের নিদর্শন।

মূত্রমার্গের সংক্রমণে অধিক জলপান করা খুবই দরকার।

৩. **মূত্রমার্গে সংক্রমণের কারণের চিকিৎসা :** জরুরি পরীক্ষার মাধ্যমে, মূত্রমার্গের কোনও সমস্যার কারণে বারবার সংক্রমণ হচ্ছে বা চিকিৎসাতে সুবিধা হচ্ছে না, তার নির্ণয় করা হয়। এই নির্ণয়ের উপর ভিত্তি করে, ওষুধের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন বা কিছু রোগীর অপারেশন করা হয়।

মূত্রমার্গে যক্ষ্মা

যক্ষ্মার (টি. বি) প্রভাব শরীরের বিভিন্ন অংশে পরে, তার মধ্যে 4 থেকে ৪ শতাংশ রোগীদের কিডনির উপরেও প্রভাব পরে। মূত্রমার্গে বারবার সংক্রমণ হবার একটি কারণ হল যক্ষ্মা।

মূত্রমার্গে যক্ষ্মার লক্ষণ :

- এই রোগ সাধারণত ২৫থেকে ৪০ বছর বয়সের মধ্যে এবং মহিলাদের থেকে পুরুষদের মধ্যে অধিক দেখা যায়।
- ২০ থেকে ৩০ শতাংশ রোগীদের মধ্যে এই রোগের কোনও লক্ষণ দেখা যায় না। কিন্তু হঠাৎ করে অন্য রোগের পরীক্ষা নিরীক্ষার সময় এই রোগের নির্ণয় হয়।
- প্রস্রাব ত্যাগের সময় জ্বলনের অনুভূতি, বার বার প্রস্রাব হওয়া, এবং সাধারণ চিকিৎসাতে সুস্থ না হওয়া।
- প্রস্রাব লাল হওয়া।
- মাত্র ১০ থেকে ২০ শতাংশ রোগীর ক্ষেত্রে জ্বর, দুর্বলতা, ওজন কমে যাওয়া, ক্ষুধামান্দ্য ইত্যাদি যক্ষ্মার নিদর্শন দেখা যায়।
- মূত্রমার্গে যক্ষ্মার গুরুতর প্রভাবের কারণে অত্যাধিক সংক্রমণ, পাথর হওয়া, রক্তচাপ বৃদ্ধি পাওয়া এবং মূত্রমার্গের অবরোধের ফলে কিডনি ফুলে যাওয়ার মতো সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।

মূত্রমার্গের যক্ষ্মার নির্ণয় :

১. প্রস্রাবের পরীক্ষা :

- এটি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। প্রস্রাবে পুঁজ এবং রক্ত দেখা দেওয়া বা প্রস্রাব অ্যাসেডিক হওয়া।
- বিশেষ ধরনের পরীক্ষার মাধ্যমে, প্রস্রাবে যক্ষ্মা রোগের জীবাণু দেখা যায়

**মূত্রমার্গের সংক্রমণের সফল চিকিৎসার জন্য,
বার বার সংক্রমণের কারণ জানা দরকার।**

(Urinary AFB)

- প্রস্রাবের কালচার পরীক্ষাতে কোনও জীবাণু দেখতে না পাওয়া (Negative Urine culture)

২. সোনোগ্রাফি :

প্রাথমিক অবস্থায় এই ধরনের পরীক্ষাতে কিছু ধরা পড়ে না। অনেক সময় যক্ষার ক্ষতিকারক প্রভাবে কিডনি ফুলতে বা সংকুচিত হতে দেখা যায়।

৩. আই. ভি. পি (IVP) :

বিশেষ উপযোগী এই পরীক্ষার মাধ্যমে যক্ষ্মার কারণে মূত্রবাহিনীর সংকোচন, কিডনির আকারের পরিবর্তন (স্ফীতি বা সংকোচন) বা মূত্রাশয়ের সংকোচন ইত্যাদি নির্ণয় সম্ভব।

৪. অন্যান্য পরীক্ষা :

কিছু রোগীর ক্ষেত্রে মূত্রনালিকা এবং মূত্রাশয়ের দূরবিন দ্বারা (সিস্টোস্কোপি) এবং বায়োপ্সির দ্বারা পরীক্ষাতে ভাল ফল পাওয়া যায়।

মূত্রমার্গের যক্ষ্মার চিকিৎসা :

১. ওষুধ : মূত্রমার্গের যক্ষ্মাতে ফুসফুসের যক্ষ্মাতে ব্যবহৃত ওষুধই ব্যবহার করা হয়। সাধারণত প্রথম দুমাসে চার প্রকারের ওষুধ এবং তার পরে তিন প্রকারের ওষুধ ব্যবহার করা হয়।

২. অন্য চিকিৎসা : মূত্রমার্গে যক্ষ্মার কারণে যদি মূত্রমার্গে অবরোধ হয়, তাহলে তার চিকিৎসা দূরবিন অথবা অপারেশন দ্বারা করা হয়। কোনও রোগীর কিডনি যদি বিকল হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তা অপারেশন দ্বারা বের করে দেওয়া হয়।

মূত্রমার্গের যক্ষ্মা প্রস্রাবে বার বার সংক্রমণ হবার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

অধ্যায় ২০.
পাথর রোগ

অনেক রোগীর ক্ষেত্রে দেখা যায় এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ রোগ হল পাথরের রোগের সমস্যা। পাথরের কারণে অসহ্য যন্ত্রণা, প্রস্রাবের সংক্রমণ এবং কিডনি ক্ষতি হতে পারে। এই কারণে পাথরের ব্যাপারে এবং তা প্রতিরোধের ব্যাপারে জানা দরকার।

পাথর রোগ কী?

প্রস্রাবে ক্যালসিয়াম অক্সালেট বা অন্যান্য ক্ষার কণার (Crystals) একে অন্যের সাথে মিশে কিছু সময়ের মধ্যেই ধীরে ধীরে মূত্রমার্গে কঠিন পদার্থের সৃষ্টি হতে থাকে, যাকে পাথর নামে জানা যায়।

পাথর কত বড় হয়? দেখতে কেমন হয়? মূত্রমার্গের কোনও অংশে দেখা যায়?

মূত্রমার্গে হওয়া পাথর বিভিন্ন আকারের এবং লম্বায় বিভিন্ন ধরনের হয়। ইহা বালির দানার মতো ছোট বা গমের দানার মতো বড়ও হতে পারে। কিছু পাথর গোল বা ডিমের আকারের এবং বাইরের অংশ চকচকে হয়। এই ধরনের পাথরের ক্ষেত্রে যন্ত্রণা কম হয় এবং ইহা স্বাভাবিকভাবে প্রাকৃতিকরূপে প্রস্রাবের সাথে বাইরে বেরিয়ে যায়।
কিছু পাথর মসৃণ হয় না। এক্ষেত্রে খুব যন্ত্রণা হয় এবং ইহা সহজে প্রস্রাবের সাথে সাথে বাইরে বেরোয় না।
পাথর মুখ্যত কিডনি, মূত্রবাহিনী এবং মূত্রাশয়ে দেখা যায়।

পাথর কেন কেবলমাত্র বিশেষ কিছু ব্যক্তির শরীরেই দেখতে পাওয়া যায়? পাথর হওয়ার মুখ্য কারণ কী?

বেশির ভাগ মানুষের শরীরে প্রস্রাবে উপস্থিত কিছু বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ ক্ষার পদার্থের কণাকে একে অন্যের সাথে মিলতে দেয় না, যার ফলে পাথর হয় না।
কিন্তু কিছু মানুষের মধ্যে নিম্নলিখিত কারণে পাথর হবার সম্ভাবনা থাকে-

মূত্রমার্গের পাথর পেটের অসহ্য যন্ত্রণার মুখ্য কারণ।

১. জল কম পান করার অভ্যাস।
২. বংশানুক্রমিক পাথর হবার পূর্ব ইতিহাস।
৩. বার বার মূত্রমার্গের সংক্রমণ।
৪. মূত্রমার্গের অবরোধ।
৫. ভিটামিন 'সি' বা ক্যালসিয়াম জাতীয় ওষুধ অধিক সেবন।
৬. দীর্ঘ সময় শয্যাশায়ী থাকা।
৭. হাইপার প্যারা থাইরয়ডিজম-এর সমস্যা।
৮. ইউরিক অ্যাসিড বেশী হলে
৯. সিসটিনোসিস

পাথরের লক্ষণ :

- সাধারণত পাথরের সমস্যা ৩০ থেকে ৪০ বছর বয়সে, মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের মধ্যে ৩ থেকে ৪ গুণ বেশি দেখা যায়।
- অনেক সময় পাথরের নির্ণয় সহজেই হয়ে যায়। এই সব রোগীদের মধ্যে রোগের কোনও লক্ষণ দেখা যায় না। একে 'সাইলেন্ট স্টোন' বলে।
- পিঠ এবং পেটের অসহ্য যন্ত্রণা।
- বমি বমি ভাব।
- প্রস্রাবের সময় জ্বলন।
- প্রস্রাবে রক্ত আসা।
- প্রস্রাবে বার বার সংক্রমণ হওয়া।
- হঠাৎ করে প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া।

পাথরের যন্ত্রণার বিশিষ্ট লক্ষণ :

- পাথরের যন্ত্রণা, পাথরের স্থান, আকার, প্রকার এবং দৈর্ঘ্য প্রস্থের উপর নির্ভর করে।
- পাথরের যন্ত্রণা হঠাৎ করে শুরু হয়। এই যন্ত্রণা খুবই অসহ্য হয়।
- কিডনি স্টোনের যন্ত্রণা কোমর থেকে শুরু হয়ে তলপেট পর্যন্ত যায়।
- মূত্রাশয়ের পাথরের যন্ত্রণা তলপেট এবং প্রস্রাবের জায়গাতে হয়।
- এই যন্ত্রণা চলাফেরা করলে বা খারাপ রাস্তাতে গাড়ি চড়লে আরও বাড়তে থাকে।

পেটের যন্ত্রণার সাথে লাল রং-এর প্রস্রাবের মুখ্য কারণ হল পাথরের সমস্যা।

- এই যন্ত্রণা সাধারণত এক ঘন্টা পর্যন্ত থাকে, পরে তা ধীরে ধীরে নিজের থেকেই কমতে থাকে।
- বেশিরভাগ সময়ে যন্ত্রণা অধিক হলে, রোগীকে ডাক্তারের কাছে যেতে হয় এবং যন্ত্রণা কম করার জন্য ওষুধ অথবা ইনজেকশনের দরকার পড়ে।

পাথরের কারণে কি কিডনি খারাপ হতে পারে?

- হ্যাঁ, কিছু রোগীর পাথর গোল বা ডিমের আকারের এবং মসৃণ হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পাথরের কোনও লক্ষণ দেখা যায় না। এইরকম পাথর মূত্রমার্গের অবরোধ সৃষ্টি করতে পারে ফলে, কিডনিতে সৃষ্ট প্রস্রাব সহজে মূত্রমার্গে যেতে পারে না, এবং যার ফলে কিডনি ফুলে যায়।
- যদি এই পাথর রোগের সময়ে চিকিৎসা না করানো হয়, তাহলে দীর্ঘসময় পর্যন্ত কিডনি ফুলে থাকে এবং দুর্বল হতে থাকে এবং পরে তা পুরোপুরি কাজ করা বন্ধ করে দিতে পারে। এইভাবে কিডনি খারাপ হবার পরে যদি পাথর বেরও করে দেওয়া হয়, তাহলেও কিডনির কাজ করার সম্ভাবনা খুব কম থাকে।

মূত্রমার্গে পাথরের নির্ণয় :

- পাথরের নির্ণয় মুখ্যত মূত্রমার্গের সোনোগ্রাফি এবং পেটের এক্স-রের সাহায্যে করা হয়।
- আই. ভি. পি (Intra Venous Pyelography) পরীক্ষা : সাধারণত এই পরীক্ষা অপারেশন বা দূরবিন দ্বারা চিকিৎসার পূর্বে করা হয়।
- এই পরীক্ষা দ্বারা পাথরের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, আকার এবং স্থানের ব্যাপারে জানা যায় এবং সেই সঙ্গে কিডনির কার্যক্ষমতা এবং কিডনি কতটা ফুলে আছে তাও জানা যায়।
- প্রস্রাব এবং রক্তের পরীক্ষার দ্বারা প্রস্রাবের সংক্রমণ, তার তীব্রতা, এবং কিডনির কার্যক্ষমতা সম্বন্ধে জানা যায়।

মূত্রমার্গের পাথরের চিকিৎসা :

পাথরের জন্য কোনও চিকিৎসা জরুরি তা, পাথরের দৈর্ঘ্য, স্থান পাথরের কারণে উদ্ভূত যন্ত্রণা বা কষ্টকে মাথায় রেখে বিচার করা হয়। সেই চিকিৎসা পদ্ধতিকে

বিনা যন্ত্রণার পাথরের কারণে কিডনি খারাপ হবার ভয় বেশি থাকে।

দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে-

- ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা (Conservative Medical Treatment)
- মূত্রমার্গের পাথর বের করার বিশেষ চিকিৎসা (অপারেশন, দূরবিন, লিথোট্রিপসি ইত্যাদি)।

ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা :

৫০ শতাংশ রোগীর পাথরের আকার ছোট হয়, যা প্রাকৃতিক রূপে ৩ থেকে ৬ সপ্তাহে নিজের থেকে প্রস্রাবের সাথে বেরিয়ে যায়। এই সময়ে রোগীর যন্ত্রণা উপশম করার জন্য এবং পাথরকে তাড়াতাড়ি বের করার জন্য ওষুধ দেওয়া হয়।

১. ওষুধ এবং ইনজেকশন :

পাথরের কারণে উদ্ভূত অসহ্য যন্ত্রণা কম করার জন্য শীঘ্র এবং দীর্ঘকালীন প্রভাবশীল ওষুধ অথবা ইনজেকশন দেওয়া হয়।

২. অধিক জলপান :

যন্ত্রণা কম হবার পরে, রোগীকে অধিক মাত্রায় জলপান করার পরামর্শ দেওয়া হয়। অধিক জলপান বা তরল গ্রহণ করলে, প্রস্রাব বেশি হয় এবং প্রস্রাবের সাথে পাথর বাইরে বেরিয়ে যাবার সুবিধা হয়। যদি বমির কারণে জলপান করা সম্ভব না হয় তাহলে, সেইসব রোগীকে শিরাতে বোতলের গ্লুকোজ দেওয়া হয়।

৩. প্রস্রাবে সংক্রমণের চিকিৎসা :

পাথরের বেশ কিছু রোগীর প্রস্রাবে সংক্রমণ দেখা যায়, যার অ্যান্টিবায়োটিকস দ্বারা চিকিৎসা করা হয়।

মূত্রমার্গের পাথর বের করার বিশেষ চিকিৎসা :

যদি প্রাকৃতিক রূপে পাথর না বেরোয়, তাহলে পাথর বের করার কিছু পদ্ধতি আছে। পাথরের আকার স্থান এবং প্রকারের উপর নির্ভর করে ইউরোলজিস্ট বা সার্জেন নির্ণয় করেন যে কোনও পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে।

প্রত্যেক পাথরই কি তৎক্ষণাৎ বের করা দরকার?

পাথরের নির্ণয়ের মুখ্য পরীক্ষা হল সোনোগ্রাফি এবং এক্স-রে

না, যদি পাথর থেকে বার বার সংক্রমণ, যন্ত্রণা, প্রস্রাবে রক্ত আসা, মূত্রমার্গের অবরোধ, কিডনি খারাপ ইত্যাদি না হয় তাহলে এমন পাথর তৎক্ষণাৎ বের করার দরকার নেই। ডাক্তারবাবু এই ধরনের পাথরের কথা মাথায় রেখে কী ধরনের চিকিৎসায় পাথর বের করা সুবিধাজনক হবে তার পরামর্শ দেন। পাথরের কারণে মূত্রমার্গে যদি অবরোধ হয়, প্রস্রাবে বার বার রক্ত বা পুঁজ আসে বা কিডনির ক্ষতি হতে থাকে, তাহলে পাথর শীঘ্র বের করা দরকার।

১. লিথোট্রিপসি : (ESWL – Extra Corporeal Shock Wave)

কিডনি এবং মূত্রবাহিনীর উপরের ভাগে স্থিত পাথরকে বের করার এটি একটি অত্যাধুনিক পদ্ধতি।

এই পদ্ধতিতে বিশেষ ধরনের লিথোট্রিপসি মেশিনের সাহায্যে উৎপন্ন শক্তিশালী তরঙ্গের (Shock Wave) মাধ্যমে পাথরকে বালির মতো চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া হয়, যা ধীরে ধীরে কিছুদিনের মধ্যেই প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যায়।

সুবিধা :

- সাধারণত রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করার দরকার হয় না।
- অপারেশন এবং দূরীকরণের প্রয়োগ ছাড়াই এবং রোগীকে অজ্ঞান না করেই পাথর বের করা হয়।

অসুবিধা :

- সমস্ত ধরনের এবং বড় পাথরের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি কার্যকরী নয়।
- অনেক ক্ষেত্রে পাথর বের করার জন্য একাধিক বার এই চিকিৎসা করানোর দরকার পড়ে।
- পাথর বের করার সাথে সাথে অনেক সময়ে যন্ত্রণা বা প্রস্রাবে সংক্রমণও হতে পারে।
- বড় পাথরের চিকিৎসায়, দূরবিনের সাহায্যে কিডনি এবং মূত্রাশয়ের মধ্যে বিশেষ প্রকার নালী (D.J.Stent) রাখার প্রয়োজন হয়।

৩. কিডনি পাথরের দূরবিন দ্বারা চিকিৎসা (PCNL – Per Cutaneous Nephro Lithotripsy) :

ছোট আকারের পাথর নিজের থেকেই প্রাকৃতিকরূপে শরীর থেকে প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যায়।

- কিডনির পাথর যখন এক সি. এম. এর বড় হয় তখন তা বের করার জন্য এই আধুনিক এবং ফলপ্রসূ পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়।
- এই পদ্ধতিতে কোমরে, কিডনির পাশে একটি ছিদ্র বানিয়ে কিডনি পর্যন্ত পৌঁছনোর রাস্তা বানানো হয়। এই রাস্তার মাধ্যমে কিডনির যেখানে পাথর আছে, সেখান পর্যন্ত একটি নালী প্রবেশ করানো হয়।
- এই নালী দিয়ে পাথর দেখা সম্ভব। ছোট পাথর ফোরসেপ্স (চিমটা) এর সাহায্যে এবং বড় পাথর শক্তিশালী তরঙ্গের (Shock Wave) মাধ্যমে চূর্ণ বিচূর্ণ করে বের করা হয়।

সুবিধা :

সাধারণত পেট কেটে করা পাথরের অপারেশনে পিঠ এবং পেটের (০ থেকে) ০ সি. এম. লম্বা কাটতে হয়। কিন্তু এই আধুনিক পদ্ধতিতে কেবলমাত্র (৮) সি. এম ছোট কাটা হয়, সেজন্য অপারেশনের পরে রোগীকে কেবল অল্প কিছু দিন সময় লাগে তার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে।

৩. মূত্রাশয় এবং মূত্রবাহিনীতে উপস্থিত পাথরের দূরবিনের সাহায্যে চিকিৎসা :

মূত্রাশয় এবং মূত্রবাহিনীতে স্থিত পাথরের চিকিৎসার এটি একটি উত্তম পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে বিনা অপারেশন বা কেটে প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে (মূত্রনালিকা) এক বিশেষ ধরনের দূরবিন (Cytoscope এবং Ureteroscope) এর সাহায্যে পাথর পর্যন্ত পৌঁছানো যায় এবং পাথরকে ''শকওয়েভপ্রোব''-এর দ্বারা ছোট ছোট টুকরোতে ভেঙে বের করে দেওয়া হয়।

৪. অপারেশন :

যখন পাথর বড় আকারের হয় এবং তা উপরোক্ত চিকিৎসাতে বের করা সম্ভব না হয় তখন তা অপারেশন দ্বারা বের করা হয়।

পাথরের প্রতিরোধ

একবার পাথর প্রাকৃতিক রূপে অথবা চিকিৎসার দ্বারা বের করে দেবার পরে কি পুরোপুরি এই পাথরের সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়?
না, একবার যে রোগীর পাথর হয়, তার পুনরায় পাথর হবার সম্ভাবনা প্রায়

লিথোট্রিপসি বিনা অপারেশনে পাথর বের করার আধুনিক এবং ফলপ্রসূ পদ্ধতি।

৮০ শতাংশ থাকে। এই কারণে প্রত্যেক রোগীর সজাগ থাকা প্রয়োজন।

পুনরায় যাতে পাথর না হয় তার জন্য কী কী সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার?

পাথরের রোগে খাদ্যের উপর নিয়ন্ত্রণের একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। পুনরায় পাথর যাতে না হয় তার জন্য নিম্নলিখিত সাবধানতাগুলি অবলম্বন করা দরকার -

১. অধিক জল পান করা :

- ৩ লিটার বা ১২ থেকে ১৪ গ্লাস-এর বেশি জল বা তরল গ্রহণ করা দরকার। এটি পাথর তৈরি না হবার জন্য সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ উপায়।
- পাথরকে প্রতিরোধ করার জন্য দৈনিক জলপানের পুরো মাত্রা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
- পাথরকে প্রতিরোধ করার জন্য কতটা জলপান করা হয়েছে তার থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল কতটা প্রস্রাব হয়েছে। প্রতিদিন 2 লিটারের বেশি প্রস্রাব যাতে হয় ততটা জলপান করা দরকার।
- প্রস্রাব পুরো দিন জলের মতো পরিষ্কার হওয়া মানে, পর্যাপ্ত জলপান করা হয়েছে। হলুদ, গাঢ় প্রস্রাব হবার তাৎপর্য হল কম জলপান করা হয়েছে।
- শুধু জল ছাড়াও অন্যান্য পানীয় যেমন ডাবের জল, শরবত, লেমন, ইত্যাদিও বেশি পরিমাণে গ্রহণ করা দরকার।
- পুরো দিনে কোনও না কোনও একটি সময়ে প্রস্রাব কম এবং গাঢ় হলুদ রং-এর হয়ে থাকে। সেই সময়ে প্রস্রাবে ক্ষারের মাত্রা বেশি থাকার কারণে পাথর সৃষ্টি হবার প্রক্রিয়া খুব তাড়াতাড়ি শুরু হয়ে যায়, যা প্রতিরোধ করা খুব দরকার। পাথরকে সৃষ্টি হবার থেকে প্রতিরোধ করার জন্য বিনা ভুলে-
  - খাবার পরে তিন ঘন্টার মধ্যে
  - শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করার পরে
  - রাত্রে শোবার পূর্বে বা মধ্যরাত্রে একবার উঠে দুই গ্লাস বা তার বেশি জলপান করা দরকার।

এইভাবে দিনের যে সময়ে পাথর সৃষ্টি হবার আশঙ্কা সব থেকে বেশি হয়ে থাকে, সেই সময়ে অধিক মাত্রায় জল এবং অন্যান্য পানীয় গ্রহণ করলে প্রস্রাব পরিষ্কার এবং অধিক মাত্রায় হয়, যার ফলে পাথর সৃষ্টিকে প্রতিরোধ করা সম্ভব।

অধিক জলপান করা পাথরের চিকিৎসা এবং তাকে প্রতিরোধ করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২. আহার নিয়ন্ত্রণ :

পাথরের প্রকারের উপর নির্ভর করে, খাদ্য পানীয়র উপর পুরোপুরি সতর্কতা এবং নিয়ন্ত্রণ রাখলে পাথরকে প্রতিরোধ করা সম্ভব।

- খাবারে লবণ কম মাত্রায় গ্রহণ করা দরকার এবং নোনতা মুখরোচক খাবার, পাপড়, আচার, ইত্যাদি অধিক লবণযুক্ত পদার্থ খাওয়া উচিত নয়। পাথর প্রতিরোধ করার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচনা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অধিকাংশ রোগী এই সূচনার ব্যাপারে অবহিত থাকে না।
- লেবুর জল, ডাবের জল, মুসাম্বির রস, আনারসের রস, গাজর, করলা, বীজহীন টমেটো, কলা, বাদাম ইত্যাদির সেবন পাথর প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। এই কারণে এইসব অধিক মাত্রাতে গ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
- পাথরের রোগীদের দুগ্ধ উৎপাদনের মতো উচ্চ ক্যালসিয়ামযুক্ত পদার্থ গ্রহণ করা উচিত নয়, এই ধারণা ভুল। খাবারে গৃহীত পর্যাপ্ত ক্যালসিয়াম খাদ্যের অক্সালেটের সাথে জুড়ে যায়। এর ফলে খাদ্যনালীতে অক্সালেটের শোষণ কমে যায় এবং এর দ্বারা পাথর প্রতিরোধ হয়।
- ভিটামিন 'সি' অধিক মাত্রায় (৪ গ্রাম বা তার বেশি) গ্রহণ করা উচিত নয়।
- অক্সালেটযুক্ত পাথরের জন্য পথ্য

  নিম্নলিখিত বেশি অক্সালেটযুক্ত খাবার কম খাওয়া দরকার-
- শাক-সব্জির মধ্যে : টমেটো, ভিণ্ডি, বেগুন, শশা, পালং ইত্যাদি।
- ফলের মধ্যে : সবেদা, আমলা, আঙুর, স্ট্রবেরি, কাজু, রোজবেরী ইত্যাদি।
- পানীয়র মধ্যে : অত্যধিক গরম চা, আঙুরের রস, ক্যাডবেরি, কোকো চকলেট, থামস-আপ, পেপসি, কোকোকোলা।
- ইউরিক অ্যাসিড পাথরের পথ্য :

  নিম্নলিখিত খাদ্য পদার্থ যাতে ইউরিক অ্যাসিড বাড়তে পারে, সেগুলি কম গ্রহণ করা দরকার
- সুইট ব্রেড, হোল লুইট ব্রেড
- ডাল : মটর, মুসুর।
- সবজি : ফুলকপি, বেগুন, পালং, মাশরুম, কুমড়ো।
- ফল : সবেদা, আতা।
- মাংস : খাসি, মুরগি, মাছ, ডিম।

পর্যাপ্ত মাত্রায় জলপান করা হচ্ছে তার প্রমাণ হল জলের মতো পরিষ্কার প্রস্রাব হওয়া।

- মদ্যপান

৩. ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা :

- যে সব রোগীর প্রস্রাবে ক্যালসিয়ামের মাত্রা বেশি থাকে, সেসব রোগীকে থায়াজাইডস এবং সাইট্রেটযুক্ত ওষুধ দেওয়া হয়।
- ইউরিক অ্যাসিডের পাথরের রোগীদের অ্যালোপুরিনল (Allopurinol) এবং প্রস্রাবের ক্ষারযুক্ত (Alkaline) ওষুধ সেবনের পরামর্শ দেওয়া হয়।

৪. নিয়মিত পরীক্ষা :

বেরিয়ে যাবার বা বের করে দেবার পরে পুনরায় পাথর সৃষ্টির আশঙ্কা অধিকাংশ রোগীরই থাকে বা কিছু রোগীর পাথর থাকা অবস্থাতেও পাথরের কোনও লক্ষণ থাকে না। এই কারণে কোনও অসুবিধা না হলেও প্রত্যেক বছরে ডাক্তারের পরামর্শমত সোনোগ্রাফি করানো দরকার। সোনোগ্রাফি পরীক্ষাতে পাথর না হবার প্রমাণ অথবা প্রাথমিক অবস্থায় নির্ণয় সম্ভব।

৮০% রোগীর পাথর পুনরায় সৃষ্টি হতে পারে, সেজন্য সর্বদা খাদ্য-পানীয়ের নিয়ন্ত্রণ এবং সময়ে সময়ে পরীক্ষা করানো দরকার

অধ্যায় ২১.
প্রস্টেটের সমস্যা - বি. পি. এইচ.

প্রস্টেট নামক গ্রন্থি কেবলমাত্র পুরুষদের শরীরেই পাওয়া যায়। এই গ্রন্থি বয়সের সাথে সাথে বড় হয়ে যাবার ফলে প্রস্রাব করতে অসুবিধা হয়। এই অসুবিধা সাধারণত ৬০ বছর বয়সের পরেই অর্থাৎ বয়স্ক পুরুষদের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়।

ভারত-সহ সমগ্র বিশ্বে মানুষের জীবনকালের বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বি. পি. এইচ-এর সমস্যার রোগীরও সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রস্টেট গ্রন্থি কাকে বলে? ইহার কার্য কী?

পুরুষদের সুপারির আকারের প্রস্টেট গ্রন্থি মূত্রাশয়ের নীচের (Bladder Neck) অংশে অবস্থিত, যা মূত্রনালিকার শুরুর অংশে মূত্রনালিকাকে পরিবেষ্টন করে থাকে। অর্থাৎ মূত্রনালিকা থেকে নিষ্কাশিত মূত্রনালিকার প্রারম্ভিক অংশ প্রস্টেটের মধ্য দিয়ে যায়। বীর্য পরিবহনকারী নালিগুলি প্রস্টেটের মধ্য দিয়ে মূত্রনালিকার দুই দিকে খোলে। এই কারণে প্রস্টেট গ্রন্থি পুরুষদের প্রজনন তন্ত্রের একটি মুখ্য অঙ্গ।

বি. পি. এইচ. বিনাইন প্রস্টেটিক হাইপারট্রফি কী? :

বিনাইন প্রস্টেটিক হাইপারট্রফি (Benign Prostratic Hypertrophy), অর্থাৎ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক প্রস্টেট গ্রন্থির আকার বৃদ্ধি।

এই বি. পি. এইচ এর সমস্যায় সংক্রমণ, ক্যানসার বা অন্য কারণে উদ্ভূত প্রস্টেটের সমস্যা মিশে থাকে না।

বি. পি. এইচ এর লক্ষণ :

বি. পি. এইচ. এর উদ্ভূত পুরুষদের সমস্যাগুলি হল :

- রাত্রে বার বার প্রস্রাব করতে যাওয়া।
- প্রস্রাবের ধারা পাতলা এবং ধীরগতির হওয়া।
- প্রস্রাবের শুরুতে দেরি হওয়া।

বি. পি. এইচ কেবলমাত্র পুরুষদের রোগ, যাতে বয়সকালে প্রস্রাব করতে অসুবিধা হয়

- থেমে থেমে প্রস্রাব হওয়া।
- প্রস্রাবের অত্যধিক বেগ আসা, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ না থাকা, জামা কাপড়ে প্রস্রাব হয়ে যাওয়া।
- প্রস্রাব হয়ে যাওয়ার পরেও ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব আসা।
- প্রস্রাব পুরো না হওয়া এবং পুরো প্রস্রাব না হওয়ার মতো।
- অস্বস্তি হওয়া।

বি. পি. এইচ. এর কারণে উদ্ভূত সমস্যাগুলি :

১. প্রস্রাব পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং ক্যাথিটারের সাহায্যে প্রস্রাব হওয়া

২. প্রস্রাব পুরোপুরি না হবার জন্য মূত্রাশয় কখনই পুরো খালি হয় না। এই কারণে প্রস্রাবে বার বার সংক্রমণ হতে পারে এবং সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা চিকিৎসকের পক্ষেও কঠিন হয়।

৩. মূত্রমার্গের অবরোধ বাড়লে মূত্রাশয়ে বেশি পরিমাণ মূত্র জমা হয়ে যায়। এই কারণে কিডনি থেকে মূত্রাশয়ে প্রস্রাব আসার রাস্তায় অবরোধের সৃষ্টি হয়। যার ফলে মূত্রবাহিনী এবং কিডনি ফুলে যায়। যদি এই সমস্যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে তাহলে ফেলিওরের মতো গভীর সমস্যাও হতে পারে।

৪. মূত্রাশয়ে সর্বদা প্রস্রাব জমা হবার ফলে পাথর হবার সম্ভাবনা থাকে।

৫০ থেকে ৬০ বছর বয়স্ক সমস্ত পুরুষই কি প্রস্টেট বাড়ার সমস্যাতে ভোগেন?

না, প্রস্টেট গ্রন্থির আকার বাড়া সত্ত্বেও সমস্ত বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে বি. পি. এইচ. এর লক্ষণ দেখা যায় না। যেসব পুরুষের বি. পি. এইচ-এর কারণে খুব সামান্যই অসুবিধা হয়, তাদের এর জন্য কোনও চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। সাধারণত, ৬০ বছরের বেশি বয়স্ক ৫ শতাংশ পুরুষদেরই বি. পি. এইচ এর চিকিৎসার আবশ্যকতা থাকে।

বি. পি. এইচ. এর নির্ণয় :

১. রোগের লক্ষণ : রোগীর অসুবিধার মধ্যে যদি বি. পি. এইচ এর লক্ষণ থাকে, তাহলে প্রস্টেটের পরীক্ষা শল্য চিকিৎসক দ্বারা করানো দরকার।

২. প্রস্টেটের আঙুল দ্বারা পরীক্ষা : সার্জেন অথবা ইউরোলজিস্ট মলদ্বারে

বি. বি. এইচ এ প্রস্রাবের ধারা ধীরগতির হয়ে যায় এবং রাত্রে বার বার প্রস্রাব করতে যাবার দরকার হতে পারে।

আঙুল প্রবেশ করিয়ে পরীক্ষা করেন (DRE – Digital Rectal Examination) বি. পি. এইচ. এ প্রস্টেটের আকার বড় হয়ে যায় এবং আঙুলের পরীক্ষাতে প্রস্টেট মসৃণ এবং জিভের মতো নরম অনুভূত হয়।

৩. **সোনোগ্রাফি দ্বারা পরীক্ষা :** বি. পি. এইচ. এর নির্ণয়ে এই পরীক্ষা খুবই উপযোগী। বি. পি. এইচ. এর কারণে প্রস্টেটের আকার বেড়ে যাওয়া, প্রস্রাব করার পরে মূত্রাশয়ে প্রস্রাব থেকে যাওয়া, মূত্রাশয়ের পাথর, মূত্রবাহিনী এবং কিডনির ফুলে যাওয়ার পরিবর্তন সোনোগ্রাফিতে ধরা পড়ে।

৪. **ল্যাবরেটরি পরীক্ষা :** এই পরীক্ষার মাধ্যমে বি. পি. এইচ. এর নির্ণয় সম্ভব নয়। কিন্তু বি. পি. এইচ. থেকে উদ্ভূত সমস্যার নির্ণয়ে সুবিধা হয়। প্রস্রাবের পরীক্ষা প্রস্রাবে সংক্রমণের নির্ণয়ের জন্য এবং রক্তের ক্রিয়েটিনিনের পরীক্ষা কিডনির কার্যক্ষমতার ব্যাপারে তথ্য দেয়। প্রস্টেটের সমস্যা প্রস্টেট ক্যান্সারের কারণ কি না তা রক্তের একটি বিশেষ পরীক্ষা (PSA - Prostate Specific Antigen) দ্বারা নির্ণয় করা হয়।

৫. **অন্যান্য পরীক্ষা :** বি. পি. এইচ. এর মতো লক্ষণযুক্ত সমস্ত রোগীরই বি. পি. এইচ. এর সমস্যা থাকে না। রোগীর এইসব সমস্যা নির্ণয়ের জন্য অনেক সময় ইউরোফ্লোমেট্রি (Uroflowmetry), সিস্টোস্কোপি এবং ইউরেথ্রোগাম-এর মতন বিশিষ্ট পরীক্ষা করা হয়।

বি. পি. এইচের রোগীদের কি প্রস্টেট ক্যান্সারের সমস্যা হতে পারে?
হ্যাঁ। কিন্তু ভারতে বি. পি. এইচ. এর মতো সমস্যার রোগীদের মধ্য থেকে খুবই কম সংখ্যক রোগীরই ক্যান্সারের সমস্যা হয়।

প্রস্টেট ক্যান্সারের নির্ণয় :

১. **প্রস্টেটের আঙুল দ্বারা পরীক্ষা :** এই পরীক্ষাতে (Digital Rectal Examination) প্রস্টেট যদি কঠিন পাথরের মতো বা গাঁটের মতো এবড়ো খেবড়ো লাগে, তাহলে তা ক্যান্সারের সংকেত হতে পারে।

২. **রক্তের পি. সি. এ.র পরীক্ষা :** রক্তের এই বিশেষ প্রকার পরীক্ষাতে যদি পি. সি. এর মাত্রা অধিক থাকে তাহলে তা ক্যান্সারের নিদর্শন হতে পারে।

বড় বয়সের পুরুষদের প্রস্রাব আটকে যাবার মুখ্য কারণ হল বি. পি. এইচ

৩. **প্রস্টেটের বায়োপসি :** বিশেষ প্রকারের সোনোগ্রাফি প্রোবের সাহায্যে মলদ্বারে সুচ প্রবেশ করিয়ে প্রস্টেটের বায়োপসি নেওয়া হয়। পরে হিস্টোপ্যাথোলজি পরীক্ষার দ্বারা প্রস্টেট এবং ক্যান্সারের ব্যাপারে পুরো জানা যায়।

বি. পি. এইচ. এর চিকিৎসা :

বি. পি. এইচ. এর চিকিৎসা দুইভাগে করা যায়-

১. ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা।

২. বিশেষ চিকিৎসা।

১. ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা :

- যখন বি. পি. এইচ-এর কারণে প্রস্রাবের সমস্যা বেশি না থাকে, তখন অধিকাংশ রোগীর চিকিৎসা ওষুধের সাহায্যে সহজে এবং কার্যকরীরূপে করা সম্ভব।
- এই ধরনের ওষুধের মধ্যে আলফা ব্লকার্স (প্রজোসিন, টেরাজোসিন, ডক্সাজোসিন, ট্যামসোলেসিন ইত্যাদি), ফিনাস্টেরাইড বা ডিইরেস্টরাইড ইত্যাদি থাকে।
- ওষুধের চিকিৎসাতে মূত্রমার্গের অবরোধ কমতে থাকে এবং প্রস্রাব সহজে বিনা বাধায় হয়।

বি. পি. এইচ. এর কোন রোগীদের বিশেষ চিকিৎসার দরকার হয়?

যেসব রোগীর সঠিক ওষুধ সেবন সত্ত্বেও অভিপ্রেত ফল পাওয়া যায় না, তাঁদের বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।

নিম্নলিখিত সমস্যাগুলিতে দূরবিন অপারেশন বা অন্যান্য বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।

- চেষ্টা করা সত্ত্বেও প্রস্রাব না হওয়া বা ক্যাথিটারের সাহায্যে প্রস্রাব হওয়া।
- প্রস্রাবে বার বার সংক্রমণ হওয়া বা প্রস্রাবে রক্ত আসা।
- প্রস্রাব ত্যাগ করার পরেও মূত্রাশয়ে প্রস্রাব অধিক মাত্রায় থেকে যাওয়া।
- মূত্রাশয়ে অধিক মাত্রায় প্রস্রাব জমা হবার ফলে, কিডনি এবং মূত্রবাহিনী ফুলে যাওয়া।

বি. পি. এইচ-এর নির্ণয়ের জন্য প্রধান পরীক্ষা হল প্রস্টেটের আঙুল দ্বারা পরীক্ষা এবং সোনোগ্রাফি

● প্রস্রাব জমা হবার ফলে পাথর হওয়া।

বিশেষ চিকিৎসা :

ওষুধ দ্বারা চিকিৎসাতে অভিপ্রেত ফল না পাওয়ার পরে নিম্নলিখিত বিশেষ চিকিৎসা করা হয় -

১. দূরবিন দ্বারা চিকিৎসা - টি, ইউ, আর, পি. (T.U.R.P – Trans Urethral Resection of Prostate) :

বি. পি. এইচ-এর চিকিৎসার জন্য এটি একটি সরল ফলপ্রসূ এবং সর্বাধিক প্রচলিত পদ্ধতি। বর্তমান সময়ে ওষুধের দ্বারা চিকিৎসায় ফল পান না, এমন অধিকাংশ (৫ শতাংশের বেশি) বি. পি. এইচ-এর রোগীদের সমস্যা এই পদ্ধতিতে দূর করা যায়।

- এই পদ্ধতিতে অপারেশন, ছেঁড়া কাটার কোনও প্রয়োজন হয় না।
- এই চিকিৎসা রোগীকে সাধারণত সংজ্ঞাহীন না করে, শিরদাঁড়াতে ইনজেকশন (Spinal Anesthesia) দিয়ে কোমরের নিচের অংশ অবশ করা হয়।
- এই প্রক্রিয়াতে প্রস্রাবের রাস্তাতে (মূত্রনালিকা) দূরবিন (Endoscope) প্রবেশ করিয়ে প্রস্টেট গ্রন্থির অবরোধ সৃষ্টি করার অংশটি বের করে দেওয়া হয়।
- এই প্রক্রিয়াতে দূরবীন অথবা, ভিডিও এন্ডোস্কোপি দ্বারা সর্বদা নজর রাখা হয়, যাতে প্রস্টেটের অবরোধ সৃষ্টি করার অংশটি সঠিকভাবে বের করা যায় এবং এই সময়ে রক্তপাতের প্রস্টেটের অবরোধ সৃষ্টি করার অংশটি সঠিকভাবে বের করা যায় এবং এই সময়ে রক্তপাতের উপর নিয়ন্ত্রণ পাওয়া যায়।
- এই অপারেশনের পরে সাধারণত রোগীকে তিন থেকে চার দিন হাসপাতালে থাকতে হয়।

২. অপারেশন দ্বারা চিকিৎসা (Open Surgery) :

যখন প্রস্টেট গ্রন্থি খুবই বড় হয়ে গিয়ে থাকে, বা একই সঙ্গে মূত্রাশয়ের পাথরের অপারেশনও করা দরকার তখন ইউরোলজিস্ট তার অভিজ্ঞতা অনুসারে এই অপারেশন দূরবিন দ্বারা করেন না। এইরকম রোগীদের অপারেশন পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়। এই অপারেশনে তলপেট এবং মূত্রাশয়ের মধ্যের প্রস্টেট গ্রন্থিকে

বর্তমানে অধিকাংশ বি. পি. এইচ-এর রোগীদের চিকিৎসা ওষুধের দ্বারা হতে পারে।

কেটে বের করা হয়।

চিকিৎসার অন্যান্য পদ্ধতি :

বি. পি. এইচ. এর চিকিৎসার কম প্রচলিত পদ্ধতিগুলি হল –

- দূরবিনের সাহায্যে প্রস্টেটের উপর ছিদ্র করে মূত্রমার্গের অবরোধকে কম করা (TUIP – Transurethral Incision of Prostate)।
- লেজার দ্বারা চিকিৎসা (Transurethral Laser Prostatectomy)।
- গরম দ্বারা চিকিৎসা (Thermal Ablation)।
- মূত্রমার্গে বিশেষ নালী দ্বারা চিকিৎসা (Urethral Stenting)।

বি. পি. এইচ. এ ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা অসফল হবার পর টি. ইউ. আর. পি. হল সব থেকে কার্যকরী এবং সর্বাধিক প্রচলিত চিকিৎসা।

অধ্যায় ২২.
ওষুধ থেকে উদ্ভূত কিডনির সমস্যা

ওষুধ সেবন করলে, অন্যান্য অঙ্গের তুলনায় কিডনির ক্ষতি হবার আশঙ্কা কেন বেশি থাকে?

ওষুধ সেবনের ফলে কিডনির ক্ষতি হবার আশঙ্কা বেশি হবার মুখ্য দুটি কারণ হল :

১. কিডনি অধিকাংশ ওষুধকে শরীর থেকে নিষ্কাশন করে। এই প্রক্রিয়াতে কিছু ওষুধ বা ওষুধ থেকে রূপান্তরিত পদার্থ কিডনির ক্ষতি করতে পারে।
২. হৃদয় থেকে যত রক্ত প্রতি মিনিটে পুরো শরীরে আসে তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ আসে কিডনিতে। উচ্চতা এবং ওজন অনুসারে পুরো শরীরে সবথেকে বেশি রক্ত কিডনিতে আসে। এই কারণে কিডনির পক্ষে ক্ষতিকারক ওষুধ বা অন্য পদার্থ কম সময়ে অধিক মাত্রাতে কিডনিতে পৌঁছয়। যার ফলে কিডনির ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

কিডনির পক্ষে ক্ষতিকারক ওষুধগুলি হল :

১. যন্ত্রণানাশক ওষুধ (Pain Killer) : শরীর এবং গাঁটের অল্প স্বল্প যন্ত্রণার জন্য বিনা ডাক্তারের পরামর্শে যন্ত্রণানাশক ওষুধ সেবন বর্তমানে সাধারণ ব্যাপার হয়ে গেছে বর্তমানে। এইভাবে নিজে নিজে ওষুধ খাবার কারণে কিডনি খারাপ হবার আশঙ্কা সব থেকে বেশি।

যন্ত্রণানাশক ওষুধ কাকে বলে? এর মধ্যে কোনও কোন ওষুধ থাকে?

যন্ত্রণা কম করার এবং জ্বর কম করার জন্য ব্যবহৃত ঔষধাবলিকে যন্ত্রণানাশক (Nonsteroidal Anti Inteflammatory drugs NSAIDs) ওষুধ বলে। এই ধরনের অধিকতর ব্যবহৃত ওষুধগুলি হল—আইবুপ্রোফেন, কিটোপ্রোফেন, ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম, নীমেসুলাইড ইত্যাদি।

যন্ত্রণানাশক ওষুধ থেকে কি প্রত্যেক রোগীরই কিডনি খারাপের আশঙ্কা থাকে?

না, ডাক্তারবাবুদ্ধ পরামর্শমতো সুস্থ ব্যক্তি উচিত মাত্রাতে এবং সঠিক সময়ে

> **ইচ্ছেমতো যন্ত্রণানাশক ওষুধের সেবন কিডনির জন্য হানিকারক হতে পারে।**

যন্ত্রণানাশক ওষুধ সেবন করলে, তা পুরোপুরি সুরক্ষিত।

যন্ত্রণানাশক ওষুধ থেকে কিডনি খারাপ হবার আশঙ্কা কখন থাকে?

- বিনা ডাক্তারের পরামর্শে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অধিক মাত্রায় যন্ত্রণানাশক ওষুধ ব্যবহার করলে কিডনি খারাপ হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে।
- অধিক বয়স, কিডনি, ফেলিওর, ডায়াবিটিস এবং যদি শরীরে জলের মাত্র কম থাকে তাহলে এইসব রোগীদের যন্ত্রণানাশক ওষুধ সেবন মারাত্মক হতে পারে।

কিডনি ফেলিওর রোগীদের জন্য কোন কোন যন্ত্রণানাশক ওষুধ সব থেকে সুরক্ষিত?

কিডনি ফেলিওর রোগীদের জন্য প্যারাসিটামল অন্যান্য যন্ত্রণানাশক ওষুধের থেকে সুরক্ষিত।

অনেক রোগীকে হৃদযন্ত্রের সমস্যার জন্য সর্বদা অ্যাসপিরিন সেবন করার পরামর্শ দেওয়া হয়, এই ওষুধ কি কিডনির ক্ষতি করতে পারে?

হৃদয়ের সমস্যার জন্য অ্যাসপিরিন নিয়মিত কিন্তু কম মাত্রায় সেবন করার পরামর্শ দেওয়া হয়, যা কিডনির জন্য হানিকারক নয়।

যন্ত্রণানাশক ওষুধ অধিক সেবনের ফলে খারাপ হওয়া কিডনি কি পুনরায় ঠিক হতে পারে?

যন্ত্রণানাশক ওষুধের অল্প ব্যবহার সময়ের জন্য কিডনি হঠাৎ করে খারাপ হয়ে গিয়ে থাকলে তা বন্ধ করার পরে সঠিক চিকিৎসাতে ঠিক হতে পারে।

বয়সকালে কিছু রোগী গাঁটের ব্যথার জন্য নিয়মিতরূপে দীর্ঘ সময়ের (বেশ কয়েক বছর) জন্য যন্ত্রণানাশক ওষুধ সেবন করতে বাধ্য হন। এইরকম কিছু রোগীর কিডনি ধীরে ধীরে এমনভাবে খারাপ হয় যা পুনরায় আর ঠিক হয় না। এইরকম রোগীদের কিডনির সুরক্ষার জন্য যন্ত্রণানাশক ওষুধ ডাক্তারের পরামর্শে এবং তত্ত্বাবধানেই নেওয়া দরকার।

দীর্ঘ সময় পর্যন্ত যন্ত্রণানাশক ওষুধের সেবনের ফলে কিডনির উপর কু-প্রভাবের শীঘ্র নির্ণয় কীভাবে করা হয়?

প্রস্রাবে যদি প্রোটিন আসে তাহলে তা কিডনির উপর কু-প্রভাবের সর্বপ্রথম

যখন রোগীর বয়স অধিক হয়, শরীরে জলের মাত্রা কম বা ডায়াবিটিস থাকে তখন কিডনির উপর খারাপ প্রভাব পড়ার আশঙ্কা বেশি থাকে

এবং একমাত্র সংকেত। কিডনি বেশি খারাপ হলে, রক্ত পরীক্ষাতে ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা অধিক দেখতে পাওয়া যায়।

অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড্স :

জেন্টামাইসিন নামক ইনজেকশন যখন দীর্ঘদিন, অধিক মাত্রায় নিতে হয়, অথবা বয়সকালে যদি কিডনি দুর্বল থাকে বা শরীরে জলের মাত্রা কম থাকে, তখন এই ইনজেকশন নিলে কিডনি খারাপ হবার সম্ভাবনা থাকে। যদি এই ইনজেকশনকে বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে কিডনি অল্প সময়ে মধ্যেই পুরোপুরি কাজ শুরু করে দেয়।

৩. রেডিও কনট্রাস্ট ইনজেকশন :

বেশি বয়স, কিডনি ফেলিওর, ডায়াবিটিস, শরীরে জলের মাত্রা কম থাকা অথবা কিডনির জন্য কোনও যন্ত্রণানাশক ওষুধ গ্রহণ করতে থাকা ব্যক্তি আয়োডিন যুক্ত পদার্থর ইনজেকশন নিয়ে এক্স-রে পরীক্ষা করানোর পরে কিডনি খারাপ হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

অধিকাংশ রোগীদের কিডনির লোকসান ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যায়।

৪. আয়ুর্বেদিক ওষুধ :

- আয়ুর্বেদিক ওষুধের কখনও কোনও খারাপ বা বিপরীত প্রভাব নেই-এই ধারণা ভুল।
- আয়ুর্বেদিক ওষুধে ব্যবহৃত ভারী ধাতু (যেমন সীসা, পারদ ইত্যাদি) কিডনির ক্ষতি করতে পারে।
- কিডনি ফেলিওরের রোগীদের বিভিন্ন ধরনের আয়ুর্বেদিক ওষুধ অনেক সময় মারাত্মক হতে পারে।
- কিছু আয়ুর্বেদিক ওষুধের পটাসিয়ামের অধিক মাত্রা, কিডনি ফেলিওরের রোগীদের জন্য মারাত্মক হতে পারে।

আয়ুর্বেদিক ওষুধ কিডনির জন্য পুরোপুরি সুরক্ষিত—এই ধারণা ভুল

অধ্যায় ২৩.
অ্যাকিউট গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস্

অ্যাকিউট গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস্ এই ধরনের কিডনির রোগ, যাতে প্রধানত শরীরের ফোলাভাব, রক্তচাপের বৃদ্ধি, প্রস্রাবে প্রোটিন রক্তকণার আসা দেখতে পাওয়া যায়। এই রোগ যেকোনো বয়সেই হতে পারে, কিন্তু শিশুদের মধ্যে এই রোগ বেশি দেখা যায়। শিশুদের মুখমন্ডল ও শরীরের ফোলাভাব বা প্রস্রাব কম আসার মুখ্য কারণ অ্যাকিউট গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস্ এবং নেফ্রোটিক সিনড্রোম।

অ্যাকিউট গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস হল শিশুদের সর্বাধিক প্রচারিত রোগ। সৌভাগ্যবশত কিডনির এই রোগের কারণে সর্বদা পুরোপুরি কিডনি খারাপ হবার সম্ভাবনা খুব কম থাকে।

অ্যাকিউট গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস্ কখন হতে পারে?

সাধারণত বিটা-হিমোলাইটিক স্ট্রেপটোকক্কাই নামক ব্যাকটিরিয়া দ্বারা গলাতে হওয়া সংক্রমণ (কাশি) বা চামড়ার সংক্রমণ (ফুসকুড়ি, পুঁজ) এর পরে এই রোগ দেখা যায়। এই ধরনের সংক্রমণ হবার এক থেকে তিন সপ্তাহ পরে এই রোগের লক্ষণ দেখা যায়।

অ্যাকিউট গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস্-এর লক্ষণ :

- সাধারণত এই রোগ তিন থেকে বারো বছরের শিশুদের মধ্যে বেশি দেখতে পাওয়া যায়।
- শুরুতে সকালে চোখের নীচে এবং মুখমন্ডলে ফোলাভাব লক্ষ করা যায়।
- প্রস্রাব কোকা-কোলার মতো লাল রং এর দেখতে হয় এবং কম মাত্রায় হয়।
- ৬০ এবং ৭০ শতাংশ রোগীর বর্ধিত রক্তচাপ লক্ষ করা যায়।

রোগীদের মধ্যে প্রকাশিত মুখ্য লক্ষণসমূহ :

- কিছু রোগীর মধ্যে এই রোগ খুব গভীর হবার কারণে কিডনির কার্যক্ষমতা কমে যায়। এসব রোগীদের শরীর অধিক ফুলে যাওয়ার

অ্যাকিউট গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস্ শিশুদের মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত কিডনির রোগ

ফলে শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয়।

- কিডনি বেশি খারাপ হলে পেটের যন্ত্রণা, বমি এবং দুর্বলতা অনুভূত হয়।
- রক্ত চাপ বেশি বাড়লে, রোগী সংজ্ঞাহীন পর্যন্ত হতে পারে।

অ্যাকিউট গ্লোমেরুলোনেফ্রাউইটিস্-এর নির্ণয় :

এই রোগের নির্ণয়ের জন্য রোগের লক্ষণ এবং রোগীর প্রস্রাব এবং রক্ত পরীক্ষা করানো দরকার :

- কিডনি ফোলার কারণে প্রস্রাবে প্রোটিন, রক্তকণার উপস্থিতি।
- ৫০ শতাংশ রোগীর রক্তে ক্রিয়েটিনিন্ এবং ইউরিয়ার বর্ধিত রক্ত লক্ষ করা যায়।
- ব্যাকটিরিয়ার সংক্রমণের ফলে রক্ত এ.এস.ও টাটির (A.S.O. Titer)এর মাত্রা বেড়ে যায়, যা এই রোগের নির্ণয়ের জন্য অত্যন্ত উপযোগী।
- কিডনির সোনোগ্রাফির পরীক্ষাতে এই রোগে, কিডনির বর্ধিত আকার এবং ফোলা লক্ষ করা যায়। এছাড়া প্রস্রাবের লাল রং এর বা কম আসার কারণেও জানা যায়।
- এছাড়া প্রয়োজনীয়তা অনুসারে কিছু রোগীর রক্তের অন্যান্য পরীক্ষা ও (C-3, ANA, ANCA ইত্যাদি) করানোর দরকার হয়। যদি রোগ খুব গুরুতর হয় তাহলে, এরকম কিছু রোগীর কিডনি ফোলার সঠিক কারণ নির্ণয়ের জন্য কিডনি বায়োপসি পরীক্ষা করানোর দরকার হয়।

অ্যাকিউট গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস্ কতটা গভীর রোগ ?

অধিকাংশ রোগীদের আট থেকে দশ দিনের মধ্যে প্রস্রাবের মাত্রা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে, শরীরের ফোলা কমতে থাকে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই কিডনি পুরোপুরি ঠিক হয়ে যায়। এই রোগের কারণে কিডনি পুরোপুরি খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা কম। প্রস্রাবের রক্তকণা এবং প্রোটিন সাধারণত দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে চলে যায়।

অ্যাকিউট গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিসের চিকিৎসা :

- এই রোগ ব্যাকটিরিয়ার সংক্রমণের পরে শুরু হয়, যার চিকিৎসার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়।

(শরীর ফোলা, কোকা-কোলার মতো রং প্রস্রাবের রং এবং উচ্চ রক্তচাপ, এই রোগের নির্ণয় সূচক।)

- ফোলা কম করার জন্য লবণ এবং জল কম খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। কিছু রোগীর প্রস্রাবের মাত্রা বাড়ানোর জন্য বিশেষ ওষুধের (ডাইইউরেটিকস্) প্রয়োজন হয়।
- ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ রোগীদের উচ্চ-রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ওষুধের প্রয়োজন হয়।
- ৫ শতাংশ কম রোগীর কম প্রস্রাব, অধিক ফোলা, শ্বাসকষ্ট, রক্তের ইউরিয়া এবং ক্রিয়েটিনিন্ এর অত্যধিক মাত্রার কারণে ডায়ালিসিস্-এর প্রয়োজন হয়।
- এই রোগ শুরুর এক থেকে দু সপ্তাহ পর্যন্ত বেশি (কজ) পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই কারণে ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে, রক্তচাপ এবং শারীরিক অবস্থার কথা মাথায় রেখে চিকিৎসা করানো দরকার।

প্রতিরোধ / সতর্কতা :

কিডনির এই রোগ মুখ্যত স্ট্রেপটোকক্কাল ব্যাকটিরিয়ার সংক্রমণ বা চামড়ার সংক্রমণের কিছু দিনের পরে হয়। কিন্তু সংক্রমণের পরে কোনও রোগীর এই রোগ হবে তা মুশকিল। এইজন্য সমস্ত রোগীরই শীঘ্র চিকিৎসা করানো দরকার। সংক্রমণের পরে মুখমন্ডলে বা চোখের নীচে ফোলা লক্ষ করা গেলে তার চিকিৎসা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শুরু করে দেওয়া দরকার।

এই রোগ হবার পরে কি ভবিষ্যতে কিডনির সমস্যা হবার আশঙ্কা থাকে?

এই রোগ হবার পর অধিকাংশ রোগীরই কিডনি ঠিক হয়ে যায় এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের সমস্যা হবার কোনও আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু খুব কম সংখ্যক রোগীরই কিডনি পুরোপুরি ঠিক না হবার ফলে ভবিষ্যতে উচ্চ রক্তচাপ বা ক্রনিক কিডনি ফেলিওরের মতো সমস্যা হতে পারে। এই কারণে এই রোগ হওয়ার পর ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে প্রত্যেক রোগীর নিয়মিত রূপে নিজের চেক-আপ করানো দরকার।

অ্যাকিউট গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস্ অল্প সময়ের মধ্যেই অধিকাংশ রোগীর ঠিক হয়ে যায়।

অধ্যায় ২৪.
নেফ্রোটিক সিনড্রোম্

কিডনির এই রোগের কারণে যে কোনো বয়সে শরীরে ফোলাভাব আসতে পারে, কিন্তু এই রোগ সাধারণত শিশুদের মধ্যেই বেশি দেখা যায়। সঠিক চিকিৎসায় এই রোগ পুরোপুরি ঠিক হয়ে যাওয়া, পরে পুনরায় শরীরে ফোলাভাব আসা, এবং এই ঘটনাচক্র বেশ কয়েকবছর পর্যন্ত চলতে থাকা নেফ্রোটিক সিনড্রোমের বিশেষত্ব। দীর্ঘসময় ধরে বারবার ফোলাভাব শরীরে বার বার হবার ফলে এই রোগ রোগী বা তার পরিবারের কাছে চিন্তার কারণ।

নেফ্রোটিক সিনড্রোমে কিডনির উপরে কী কু-প্রভাব পড়ে?

সরল ভাষাতে বলা যেতে পারে যে, কিডনি শরীরে ছাঁকনির কাজ করে, যার দ্বারা অনাবশ্যক পদার্থ, অতিরিক্ত জল প্রস্রাবের মাধ্যমে শরীর থেকে বাইরে বেরিয়ে যায়।

নেফ্রোটিক সিনড্রোমে কিডনির ছাঁকনির ছিদ্র বড় হয়ে যায়, যার ফলে অতিরিক্ত জল এবং রেচন পদার্থের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের প্রয়োজনীয় পদার্থও প্রস্রাবের সাথে বেরিয়ে যায়, যার ফলে শরীরে প্রোটিনের মাত্রা কমে যায় এবং শরীর ফুলতে শুরু করে।

প্রস্রাবে আসা প্রোটিনের মাত্রা অনুসারে রোগীর শরীরের ফোলা নির্ভর করে। নেফ্রোটিক সিনড্রোমে শরীর ফোলার পরেও কিডনির অনাবশ্যক পদার্থ দূর করার ক্ষমতা যথাযথ থাকে, অর্থাৎ কিডনি খারাপ হবার সম্ভাবনা খুব কম থাকে।

নেফ্রোটিক সিনড্রোমের কারণ কী?

নেফ্রোটিক সিনড্রোমের কোনও নির্দিষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। শ্বেতকণিকাতে লিমফোসাইটই-এর কার্যক্ষমতা (Auto Immune Disease) কমে যাবার কারণে এই রোগ হয় বলে মানা হয়। আহার ও ওষুধ কোনওভাবেই এই রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী নয়।

নেফ্রোটিক সিনড্রোমের মুখ্য কারণ :

- এই রোগ মুখ্যত দুই থেকে ছয় বছরের বাচ্চাদের মধ্যে দেখা যায়। অন্য

নেফ্রোটিক সিনড্রোম শিশুদের বার বার শরীর ফুলে যাবার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ)

বয়সের মানুষের এই রোগ এর সংখ্যা শিশুদের তুলনায় খুবই কম।

- সাধারণত এই রোগ জ্বর বা কাশির পরে শুরু হয়।
- রোগের প্রারম্ভে মুখ্য লক্ষণের মধ্যে চোখের নীচে এবং মুখমণ্ডলে ফোলাভাব সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। চোখের নীচে ফোলার কারণে অনেক সময় রোগী প্রথমে চিকিৎসার কারণে চোখের ডাক্তারের কাছে যায়।
- এই রোগের বিশেষ লক্ষণ হল সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর মুখের অত্যধিক ফোলা। এই ফোলা দিন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কমতে থাকে এবং সন্ধ্যে নাগাদ প্রায় স্বাভাবিক হয়ে যায়।
- রোগ বেড়ে যাবার পরে পেট ফুলে যায়, প্রস্রাব কমে যায়, পুরো শরীর ফুলে যেতে থাকে এবং ওজন বেড়ে যায়।
- অনেকবার প্রস্রাবের জায়গাতে সাদা দাগ দেখা যায় এবং প্রস্রাবে ফেনা হয়।
- এই রোগে, লাল প্রস্রাব হওয়া, শ্বাসকষ্ট যা রক্তচাপ বৃদ্ধির মতো কোনো লক্ষণ দেখা যায় না।

নেফ্রোটিক সিনড্রোমে কি গভীর আশঙ্কার সৃষ্টি হতে পারে?

নেফ্রোটিক সিনড্রোমে কম দেখতে পাওয়া মারাত্মক আশঙ্কাগুলি হল পেটের সংক্রমণ (Peritonitis), প্রধান শিরাতে (মুখ্যত পায়ের) রক্ত জমে যাওয়া (Venous Thrombosis) ইত্যাদি।

নেফ্রোটিক সিনড্রোমের নির্ণয় :

১. প্রস্রাবের পরীক্ষা

- প্রস্রাবে অধিক মাত্রাতে প্রোটিন আসা নেফ্রোটিক সিনড্রোমের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন।
- প্রস্রাবে, শ্বেতরক্তকণিকা, লোহিতরক্ত কণিকা বা অন্যান্য রক্তকণিকার না আসা এই রোগের নির্ণয়ের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন।
- ২৪ ঘন্টাতে প্রস্রাবে আসা প্রোটিনের মাত্রা ৩ গ্রামের অধিক হয়ে যায়।
- প্রস্রাবের পরীক্ষা শুধুমাত্র রোগনির্ণয়ের জন্যই নয়, রোগের চিকিৎসার জন্যই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রস্রাবে আসা প্রোটিনের পরিমাণ যদি কমে যায়। তা চিকিৎসার সফলতা প্রমাণ করে।

শরীরের ফোলা, প্রস্রাবে প্রোটিন, রক্তে কম প্রোটিন এবং কোলেসটেরল বেড়ে যাওয়া নেফ্রোটিক সিনড্রোমের নিদর্শন

২. রক্তের পরীক্ষা

সাধারণ পরীক্ষা

অধিকাংশ রোগীদের হিমোগ্লোবিন, শ্বেতকণিকার মাত্রা ইত্যাদির পরীক্ষা প্রয়োজন অনুসারে করা হয়।

রোগনির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা

- নেফ্রোটিক সিনড্রোমের নির্ণয়ের জন্য রক্তের পরীক্ষাতে প্রোটিনের (অ্যালবুমিন) মাত্রা কম এবং কোলেসটেরলের মাত্রা বেড়ে যাওয়া আবশ্যক। সাধারণত রক্তে ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা স্বাভাবিক থাকে।

অন্যান্য বিশিষ্ট পরীক্ষা

- ডাক্তার দ্বারা প্রয়োজনীয়তা অনুসারে অনেক সময় করানো রক্তের বিশেষ পরীক্ষাগুলি হল কমপ্লিমেন্ট, এ. এস. ও. টাইটার, এ. এন. এ. টেস্ট, এইডস, হিপাটাইটিস ইত্যাদি।

৩. রেডিওলজিক্যাল পরীক্ষা

- এই প্রকার পরীক্ষাতে পেট এবং কিডনির সোনোগ্রাফি, বুকের এক্স-রে ইত্যাদি অন্যতম।

নেফ্রোটিক সিনড্রোমের চিকিৎসা

নেফ্রোটিক সিনড্রোমের চিকিৎসাতে খাদ্য-পানীয় নিয়ন্ত্রণ, কিছু বিশেষ সাবধানতা, এবং ওষুধ সেবন গুরুত্বপূর্ণ -

১. খাদ্য-পানীয়র নিয়ন্ত্রণ

- যদি শরীর ফোলা থাকে বা প্রস্রাব কম আসে, তাহলে রোগীকে কম জল এবং লবণ খাবার পরামর্শ দেওয়া হয়।
- অধিকাংশ শিশুদের প্রোটিন সাধারণ মাত্রাতে খাবার পরামর্শ দেওয়া হয়।

২. সংক্রমণের চিকিৎসা এবং প্রতিরোধ

- নেফ্রোটিক সিনড্রোমের চিকিৎসা শুরু করার আগে, যদি শিশুর কোনো সংক্রমণের সমস্যা থাকে, তাহলে তার চিকিৎসা করে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে আনা খুবই জরুরি।

প্রস্রাবের পরীক্ষা নেফ্রোটিক সিনড্রোমের নির্ণয় এবং চিকিৎসার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

- নেফ্রোটিক সিনড্রোমে পীড়িত বাচ্ছাদের সর্দি, জ্বর এবং অন্যান্য সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি থাকে।

  চিকিৎসার মধ্যে সংক্রমণ হলে, রোগ গভীর হয়। এই কারণে চিকিৎসার মধ্যে যাতে সংক্রমণ না হয় তার জন্য পুরো সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার এবং সংক্রমণ হলে শীঘ্র তার চিকিৎসা করানো দরকার।

৩. ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা

সাধারণ চিকিৎসা

ফোলার উপর নিয়ন্ত্রণ পাবার জন্য, যাতে প্রস্রাব বেশি মাত্রাতে হয় সেজন্য বিশেষ ওষুধ (ডাইইউরেটিক্স) অল্প সময়ের জন্য ব্যবহার করা হয়।

বিশেষ চিকিৎসা

নেফ্রোটিক সিনড্রোমের সফল চিকিৎসার জন্য সর্বাধিক প্রচলিত এবং কার্যকর ওষুধের নাম হল প্রেডনিসোলোন। প্রেডনিসোলোন স্টেরয়েড গ্রুপের ওষুধ। কিছু রোগীর রোগের উপর প্রেডনিসোলোন দ্বারা কার্যকারীরূপে নিয়ন্ত্রণ পাওয়া যায় না, তাদের অন্য ওষুধ দেওয়া হয়।

প্রেডনিসোলোন কি কাজ করে এবং প্রেডনিসোলোন কীভাবে দেওয়া হয়?

- প্রেডনিসোলোন প্রস্রাবে প্রোটিন আসা প্রতিরোধ করার জন্য একটি কার্যকর ওষুধ। এই ওষুধ কী পরিমাণে দেওয়া হবে তা শিশুর ওজন এবং রোগের গভীরতার উপর নির্ভর করে ডাক্তারবাবু ঠিক করে থাকেন।
- এই ওষুধ সেবন করার পরে, এক থেকে চার সপ্তাহের মধ্যেই বেশিরভাগ রোগীর প্রস্রাবে প্রোটিন আসা বন্ধ হয়ে যায়।

প্রেডনিসোলোনের কু-প্রভাব (Side-Effect) কী?

প্রেডনীসোলোন নেফ্রোটিক সিনড্রোমের চিকিৎসার প্রধান ওষুধ, কিন্তু এই ওষুধের কিছু খারাপ প্রভাব আছে।

এইসব খারাপ প্রভাবকে কম করার জন্য এই ওষুধের সেবন ডাক্তারের পরামর্শে এবং তত্ত্বাবধানেই করা দরকার।

অল্প সময়ের মধ্যে প্রকাশিত দুষ্প্রভাব বা বিপরীত প্রভাব :

অধিক ক্ষিধা পাওয়া, ওজন বাড়া, অ্যাসিডিটি, পেটে বা বুকের যন্ত্রণা, খিটখিটে

নেফ্রোটিক সিনড্রোমের চিকিৎসায় প্রেডনিসোলোন সর্বাধিক ব্যবহৃত এবং কার্যকর ওষুধ

মেজাজ, সংক্রমণের সম্ভাবনার বৃদ্ধি, রক্তচাপের বৃদ্ধি ইত্যাদি।

দীর্ঘদিনের পরে প্রকাশিত দুষ্প্রভাব বা বিপরীত প্রভাব :

শিশুদের বিকাশ কম হওয়া (উচ্চতা কম বৃদ্ধি পাওয়া), হাড় দুর্বল হওয়া, চামড়ায় টান পড়লে জঙ্ঘা বা পেটের নীচের অংশে গোলাপি রেখার প্রকাশ, চোখে ছানি পড়ার (cataract) আশঙ্কা ইত্যাদি।

এত বেশি বিপরীত প্রভাবযুক্ত প্রেডনিসোলোন সেবন কি শিশুদের জন্য লাভজনক?

হ্যাঁ, সাধারণত যখন এই ওষুধ অধিক মাত্রায় দীর্ঘদিনের জন্য সেবন করা হয়, তখন বিপরীত প্রভাব হবার আশঙ্কা বেশি থাকে। ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে সঠিক মাত্রায় এবং কম সময়ের জন্য ওষুধ সেবন করলে ওষুধের বিপরীত প্রভাব কম এবং অল্প সময়ের জন্যই হয়। যখন এই ওষুধের সেবন ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে করা হয়। তখন গভীর এবং বিপরীত প্রভাব শুরুতেই নির্ণয় হয়ে যায়, এবং শীঘ্রই চিকিৎসাতে পরিবর্তনের মাধ্যমে বিপরীত প্রভাব প্রতিরোধ করা সম্ভব।

তথাপি, রোগের কষ্ট এবং গভীরতার তুলনায় ওষুধের বিপরীত প্রভাব কম ক্ষতিকারক। এইজন্য অধিক লাভের জন্য অল্প বিপরীত প্রভাবকে স্বীকার করা ছাড়া কোনও রাস্তা থাকে না।

অধিকাংশ শিশুদের চিকিৎসার তিন থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে প্রস্রাবে প্রোটিন আসা কমে যায় তথানিপ শরীরে ফোলাভাব কেন থাকে?

প্রেডনিসোলোনের সেবনের ফলে ক্ষুধা বাড়ে। অধিক খাবার ফলে শরীরে চর্বি জমা হতে থাকে, যার ফলে তিন থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে শরীর আবার ফুলে গেছে বলে মনে হয়।

রোগের কারণে শরীরের ফোলাভাব এবং চর্বি জমা হবার কারণে শরীরে ফোলাভাবের মধ্যের পার্থক্য কীভাবে বোঝা সম্ভব?

নেফ্রোটিক সিনড্রোম রোগ বাড়ার কারণে উদ্ভুত ফোলাভাব সাধারণত চোখের নীচে এবং মুখমণ্ডলে দেখা যায় যা সকালে অধিক এবং সন্ধ্যায় কম থাকে। এর সঙ্গে পায়েতেও ফোলা লক্ষ করা যেতে পারে। ওষুধ সেবন করলে সাধারণত মুখমণ্ডল, কাঁধ, এবং পেটে চর্বি জমে, যার ফলে ওইসব অংশ ফোলা দেখতে

ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে সঠিকভাবে প্রেডনিসোলোন সেবন করলে বিপরীত প্রভাবকে কম করা সম্ভব।

পাওয়া যায়। এইরকম ফোলা পুরো দিনে একইরকম থাকে।
চোখ বা পা না ফোলা এবং মুখমণ্ডলের ফোলা সকালে বেশি, সন্ধ্যায় কম না হওয়ার লক্ষণ নেফ্রোটিক সিনড্রোমের কারণে নয় তার প্রমাণ করে।

নেফ্রোটিক সিনড্রোমের কারণে শরীরের ফোলা এবং ওষুধের প্রভাবে ফলে চর্বি জমার ফলে শরীরে ফোলার মধ্যে পার্থক্য জানা প্রয়োজন কেন?
রোগীর জন্য কোন চিকিৎসা সঠিক হবে তা সুনিশ্চিত করার জন্য ফোলা এবং ফোলার মতোর মধ্যের পার্থক্য বোঝা দরকার।
নেফ্রোটিক সিনড্রোমের কারণে যদি শরীরে ফোলা লক্ষ করা যায়, তাহলে ওষুধের মাত্রায় পরিবর্তন এবং সেইসঙ্গে প্রস্রাবের মাত্রা বৃদ্ধি করার ওষুধের প্রয়োজন হতে পারে।

চর্বি জমা হবার ফলে শরীর ফোলা, প্রেডনীসোলোন দ্বারা নিয়মিত চিকিৎসার ফল। এই সময়ে রোগ বেড়ে গেছে বা রোগ নিয়ন্ত্রণে নেই এরকম চিন্তার কোনও কারণ নেই। সময়ের সাথে সাথে প্রেডনীসোলোনের মাত্রা কম হবার ফলে, কিছু সপ্তাহের মধ্যেই ফোলা ধীরে ধীরে কমতে কমতে পুরোপুরি ঠিক হয়ে যায়। ওষুধের প্রভাবে উদ্ভুত শরীরের ফোলাকে শীঘ্র কম করার জন্য যে কোন প্রকারের ওষুধ সেবন রোগীর জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে।

প্রেডনীসোলোন দ্বারা চিকিৎসা যদি সফল না হয় তাহলে, অন্যান্য কি কি ওষুধের ব্যবহার করা হয়?
নেফ্রোটিক সিনড্রোমে ব্যবহৃত অন্যান্য ওষুধগুলি হল, লিডামিজোল, মিথাইল প্রেডনীসোলোন, সাইক্লোফস্‌ফেমাইড সাইক্লোস্পোরিন, এম. এম. এফ (M.M.F.) ইত্যাদি।

নেফ্রোটিক সিনড্রোমে শিশুদের কিডনী বায়োপসি কখন করা হয়?
নেফ্রোটিক সিনড্রোমে শিশুদের নিম্নলিখিত পরিস্থিতিতে কিডনী বায়োপসির প্রয়োজন হয়।

১. রোগ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যদি অধিক মাত্রায় এবং দীর্ঘদিন প্রেডনীসোলোনের প্রয়োজন হয়।
২. প্রেডনীসোলোন সেবন করার পরেও যদি রোগ নিয়ন্ত্রণে না থাকে।

শিশুদের মধ্যে এই রোগ বেশি দেখা যায় এবং এই রোগের ফলে কিডনি খারাপ হবার সম্ভাবনা খুব কম

৩. অধিকাংশ শিশুর নেফ্রোটিক সিনড্রোম হবারকারণ হল 'মিনিমাল চেনজ্ ডিজীজ'। যেসব শিশুর মধ্যে এই রোগ মিনিমাল চেনজ্ ডিজীজ-এর কারণে না হবার আশঙ্কা করা হয় (যেমন প্রস্রাবে রক্তকণিকার উপস্থিতি, রক্তে ক্রিয়েটিনিনের অধিক মাত্র, কমপ্লিমেন্ট, C-3 এর মাত্রা কমে যাওয়া) তখন কিডনীর বায়োপসির প্রয়োজন হয়।

৪. যখন এই রোগ প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে হয় তখন সাধারণত চিকিৎসা কিডনী বায়োপসির পারই করা হয়।

নেফ্রোটিক সিনড্রোমের চিকিৎসার সিদ্ধান্ত নেফ্রোলজিস্ট কিভাবে নিয়ে থাকেন?

নেফ্রোটিক সিনড্রোমের সঠিক চিকিৎসার জন্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা নিয়মিত পরীক্ষা করানো খুবই দরকার। এইসব পরীক্ষার মধ্যে সংক্রমণের প্রভাব, রক্তচাপ, ওজন, প্রস্রাবে প্রোটিনের মাত্রা এবং প্রয়োজন অনুসারে রক্তের পরীক্ষা অন্যতম। এইসব পরীক্ষার তথ্যের উপর ভিত্তি করেই ডাক্তার দ্বারা ওষুধের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হয়।

নেফ্রোটিক সিনড্রোমে কখন ঠিক হয়ে যায়?

সঠিক চিকিৎসায় অধিকাংশ শিশুরই প্রস্রাবে প্রোটিন আসা বন্ধ হয়ে যায় এবং অল্পদিনের মধ্যেই এই রোগ নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই প্রায় সমস্ত-শিশুরই এই রোগ এবং ফোলা আবার দেখা যায় এবং এই অবস্থায় চিকিৎসার পুনরায় প্রয়োজন হয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোগের বার বার ফিরে আসা কম হতে থাকে। ১১ থেকে ১৪ বছর বয়সের পরে অধিকাংশ শিশুরই এই রোগ পুনরায় ঠিক হয়ে যায়।

দীর্ঘদিন-কয়েক বছর পর্যন্ত চলার এই রোগ বয়স বাড়ার সাথে সাথে পুনরায় ঠিক হয়ে যায়।

অধ্যায় ২৫.
শিশুদের কিডনী এবং মুত্রমার্গের সংক্রমণ

শিশুদের ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় এই প্রশ্ন বেশী গুরুত্বপূর্ণ কেন?

- শিশুদের বার বার জ্বর আসার গুরুত্বপূর্ণ কারণ কিডনী এবং মুত্রমার্গের সংক্রমণ হতে পারে।
- কম বয়সে শিশুদের কিডনী অথবা মুত্রমার্গের সংক্রমণের দেরীতে চিকিৎসা বা অসম্পূর্ণ চিকিৎসার ফলে কিডনীর অপূরণীয় ক্ষতি হত পারে। অনেক সময় কিডনীর পুরোপুরি খারাপ হবার সম্ভাবনাও থাকে।
- এই কারণে, শিশুদের প্রস্রাবের সংক্রমণের শীঘ্র নির্ণয় এবং সঠিক চিকিৎসা করানো দরকার, যার দ্বারা সম্ভাব্য কিডনীর ক্ষতিকে প্রতিরোধ করা সম্ভব।

শিশুদের প্রস্রাবের সংক্রমণের সম্ভাবনা কখন বেশী থাকে?

শিশুদের মুত্রমার্গের সংক্রমণ অধিক হবার মুখ্য কারণগুলি হল

১. মেয়েদের মুত্রনালিকার দৈর্ঘ্য ছোট এবং মুত্রনালিকা এবং মলদ্বার পাশাপাশি হবার জন্য মলদ্বার থেকে জীবাণু মুত্রনালিকাতে সহজেই প্রবেশ করতে পারে এবং সংক্রমণ হতে পারে।

২. মলত্যাগ করার পরে শৌচ করবার সময় পিছন থেকে আগের দিকে ধোবার অভ্যাস।

৩. জন্মগত দোষের কারণে মুত্রাশয় থেকে প্রস্রাব উল্টোদিকে মুত্রবাহিনী এবং কিডনীর দিকে যাওয়া (Vesico Ureteric Reflux).

৪. কিডনীর ভিতরের দিকে মাঝের থেকে নীচের অংশকে জোড়ার অংশকে পেলভিস্ বলে। পেলভিস্ এবং মুত্রবাহিনী নালিকে জোড়ার অংশের সংকোচনের ফলে প্রস্রাবের মার্গে অবরোধ হওয়া (Pelvi Ureteric Junction–PUJ Obstruction).

৫. মুত্রনালিকাতে ভালভ্ (Posterior Urethral Valve)-এর কারণে কম বয়সের বাচ্ছাদের প্রস্রাব ত্যাগ করতে অসুবিধা হওয়া।

৬. মুত্রমার্গের পাথর হওয়া।

শিশুদের বার বার জ্বর আসার কারণ মুত্রমার্গের সংক্রমণ হতে পারে।

প্রস্রাবে সংক্রমণের লক্ষণ

- সাধারণত চার থেমে পাঁচ বছরের বড় বাচ্চারা প্রস্রাবে অসুবিধার কথা নিজেরাই বলতে পারে। প্রস্রাবের সংক্রমণের বিস্তৃত বিবরণ অধ্যায় ১৯ এ দেওয়া হয়েছে।
- কম বয়সের শিশুরা প্রস্রাব ত্যাগের অসুবিধার কথা নিজেরা বলতে পারে না। প্রস্রাব ত্যাগের সময় শিশুদের কান্না, প্রস্রাব ঠিকমত না হওয়া, অথবা জ্বরের জন্য প্রস্রাবের পরীক্ষাতে হঠাৎ করে সংক্রমণের উপস্থিতির কথা জানতে পারা, মুত্রমার্গের সংক্রমণের সংকেত হতে পারে।
- ক্ষুধামন্দা, ওজন না বাড়া, বা গভীর সংক্রমণ হলে পরে অত্যাধিক জ্বর আসা এবং পেট ফুলে যাওয়া, বমি হওয়া, পায়খানা হওয়া, জন্ডিস (Jaundice) হওয়ার মত অন্যান্য লক্ষণও মুত্রমার্গের সংক্রমণের কারণে কম বয়সের বাচ্চাদের মধ্যে দেখা যায়।

মুত্রমার্গের সংক্রমণের নির্ণয়

কিডনী এবং মুত্রমার্গের সংক্রমণের নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষাগুলিকে প্রধানত দুই-ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে-

১. মুত্রমার্গের সংক্রমনের নির্ণয়।
২. মুত্রমার্গের সংক্রমনের কারনের নির্ণয়।

১. মুত্রমার্গের সংক্রমণের নির্ণয়

প্রস্রাবের সাধারণ এবং কালচার পরীক্ষাতে পুঁজের (Pus) উপস্থিতি মুত্রমার্গে সংক্রমণের লক্ষণ। এই পরীক্ষা সংক্রমণের নির্ণয় এবং চিকিৎসার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

২. মুত্রমার্গের সংক্রমণের কারণের নির্ণয়

অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষার দ্বারা কিডনী বা মুত্রমার্গের জন্মগত ত্রুটি, মুত্রমার্গের অবরোধ, প্রস্রাব ত্যাগের প্রক্রিয়ার অসুবিধা ইত্যাদি সমস্যার নির্ণয় হতে পারে। এই সমস্যাগুলি মুত্রমার্গের বার বার সংক্রমণের জন্য দায়ী। এইসব সমস্যায় নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষাগুলির বিবরণ পূর্বে অধ্যায় ৪ এবং ১৯ -এ দেওয়া হয়েছে।

অধিকাংশ বাচ্চাদের প্রস্রাবের সংক্রমণের কারণের নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয়

শিশুদের মুত্রমার্গের সংক্রমনের মুখ্য লক্ষণ - জ্বর, ওজন না বাড়া এবং প্রস্রাব ত্যাগে অসুবিধা

এম. সি. ইউ. (M.C.U.) পরীক্ষা কিভাবে করা হয়? ইহা কিজন্য গুরুত্বপূর্ণ?

মিকটিউরেটিং সিস্টোইরেথ্রোগ্রাম - এম. সি. ইউ. নামে পরিচিত পরীক্ষাতে বিশেষ প্রকারের আয়োডিনযুক্ত ক্যাথিটার মুত্রাশয়ে প্রবেশ করানো হয়। এর পরে শিশুকে প্রস্রাব ত্যাগ করতে বলা হয়। প্রস্রাব ত্যাগের সময় মুত্রাশয় এবং মুত্রনালিকার এক্স-রে নেওয়া হয়। এই পরীক্ষার দ্বারা প্রস্রাবের উল্টোপথে মুত্রাশয় থেকে মুত্রবাহিনীতে প্রবেশ, মুত্রাশয়ের কোনও ক্ষতি, অথবা মুত্রাশয় থেকে প্রস্রাব বাইরে আসার পথে কোনও অবরোধের উপস্থিতির ব্যাপারে জানা যায়।

ইনট্রাভেনাস পাইলোগ্রাফি (IVP) কখন এবং কিজন্য করা হয়?

তিন বছরের অধিক বয়সের শিশুদের যখন বার বার প্রস্রাবে সংক্রমণ হতে থাকে তখন পেটের এক্স-রে এবং সোনোগ্রাফি পরীক্ষার পরে যদি প্রয়োজন হয় তাহলে এই পরীক্ষা করানো হয়। এই পরীক্ষার দ্বারা প্রস্রাবের সংক্রমণের জন্য দায়ী কোন জন্মগত দোষ বা মুত্রমার্গের অবরোধের ব্যাপারে জানা যায়।

মুত্রমার্গের সংক্রমণের চিকিৎসা

সাধারণ সাবধানতা

- বাচ্চাদের পুরো দিনে বেশী পরিমাণ এবং রাত্রেও ১ থেকে ২ বার জল খাওয়ানো দরকার।
- কোষ্ঠ-কাঠিন্য হতে দেওয়া উচিত নয়। নিয়মিতভাবে পায়খানা যাবার এবং অল্প সময়ের ব্যবধানে প্রস্রাব করার অভ্যাস করানো দরকার।
- পায়খানা এবং প্রস্রাব ত্যাগের জায়গা পুরোপুরি পরিষ্কার রাখা দরকার।
- পায়খানা করার পরে বেশী জল দিয়ে সামনের থেকে পিছনের দিকে পরিষ্কার করলে প্রস্রাবের সংক্রমণের সম্ভাবনা কম হতে পারে।
- শিশুদের স্বাভাবিক আহার দেওয়া যেতে পারে।
- জ্বর থাকলে, তা কম করার ওষুধ দেওয়া হয়।
- প্রস্রাবের সংক্রমণের চিকিৎসা পুরো হবার পরে, প্রস্রাবের পরীক্ষা করিয়ে দেখে নেওয়া দরকার যে সংক্রমণ পুরোপুরি ঠিক হয়েছে কি না।
- প্রস্রাবের সংক্রমণ আবার হয়েছে কি না, তা জানার জন্য চিকিৎসা। পুরো হবার সাত দিন পর এবং তার পরে ডাক্তারবাবুর পরামর্শ অনুসারে বার বার প্রস্রাবের পরীক্ষা করানো দরকার। ইহা অতন্ত্য জরুরী।

মুত্রমার্গের সংক্রমণের কারণের নির্ণয়ের জন্য সোনোগ্রাফি, এক্স-রে, এম. সি. ইউ., এবং আই. ভি. পি ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয়।

ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা

- প্রস্রাবের সংক্রমণের নির্ণয়ের পরে, সংক্রমণের উপর নিয়ন্ত্রণ পাবার জন্য সংক্রমণের লক্ষণ, তার গভীরতা এবং শিশুর বয়সের কথা মাথায় রেখে এ্যান্টিবায়োটিকস দ্বারা চিকিৎসা করা হয়।
- এই চিকিৎসা শুরু করার পূর্বে, প্রস্রাবের কালচার এবং সেনসিটিভিটির পরীক্ষা করানো আবশ্যক। এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে ডাক্তার দ্বারা সর্বশ্রেষ্ঠ ওষুধের নির্বাচনের দ্বারা সংক্রমণের সবথেকে ভাল চিকিৎসা হতে পারে।
- কম বয়সের বাচ্চাদের সংক্রমণ যদি গভীর হয় তাহলে এ্যান্টিবায়োটিকস ইনজেকশন দেবার প্রয়োজন হয়।
- সাধারণত ব্যবহৃত এ্যান্টিবায়োটিকগুলি হল অ্যামোক্সিসিলিন, অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইডিস, সিফালোস্পোরিন, কোট্রাইমোক্সো-জোল, নাইট্রোফিউরেন্টাইন ইত্যাদি।
- এই ধরনের চিকিৎসা সাধারণত সাত থেকে দশ দিন পর্যন্ত করা হয়। সংক্রমণের চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে সংক্রমনের কারণ অনুসারে আগের চিকিৎসাপদ্ধতির নির্বাচন করা হয়।

মুত্রমার্গের বার বার সংক্রমণের চিকিৎসা

ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা

- যেসব রোগীর বছরে তিনবারের বেশী প্রস্রাবের সংক্রমণ হয়, সেইসব রোগীকে বিশেষ ধরনের ওষুধ কম মাত্রায় রাত্রে এক বার দীর্ঘদিন (৩ মাস পর্যন্ত) ধরে সেবন করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

পোসটেরিওর ইউরিথ্রাল ভালভস্ (Posterior Urethral Valves)

পোসটেরিওর ইউরিথ্রাল ভালভস্ (PUV) হল একটি জন্মগত ইউরিথ্রার (Urethra) ত্রুটি যা কেবলমাত্র বাচ্চা ছেলেদের মধ্যেই দেখা যায়। PUVহল মুত্রমার্গের নিচের অংশের অবরোধের মুখ্য কারণ।

মৌলিক সমস্যা ও তার গুরুত্ব : PUV-র কারণ হল অসম্পূর্ণ বা অসংগঠিতভাবে কোষসমূহের ভাঁজ হয়ে যাওয়া এবং মূত্রের ধারাতে অবরোধের ফলে ব্লাডার বা মূত্রথলির উপর চাপ সৃষ্টি হয়। মূত্রথলির আকার বাড়তে থাকে

মুত্রমার্গের সংক্রমণের কার্যকারী চিকিৎসার জন্য প্রস্রাবের কালচার পরীক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

এবং ইহার মাংসল পরদা বা দেওয়াল খুব মোটা হয়ে যায়।

বর্ধিত মূত্রথলি এবং মূত্রচাপ কিডনীর উপরেও বিপরীত চাপের সৃষ্টি করে। এর ফলে মূত্রবাহিনী নালী এবং কিডনী দুটিই ফুলে যায়। এই অবস্থার সময়ে চিকিৎসা না হল তা ক্রনিক কিডনী ডিসিজে (CKD) পরিণত হতে পারে। সাধারণত PUV-এর রোগীদের মধ্যের ২৫% থেকে ৩০% শিশু এন্ড স্টেজ রেনাল ডিসিজ (ESRD) বা কিডনী ফেলিওরের শিকার হয়। সুতরাং PUV হল শিশু মৃত্যুর অন্যতম কারণ।

লক্ষণ : 'PUV'-র সাধারণ লক্ষণগুলি হল খুব ক্ষীণভাবে মূত্র শরীর থেকে বের হওয়া, থেমে থেমে মূত্র বের হওয়া, মূত্রত্যাগে কষ্ট হওয়া। রাত্রে বিছানায় মূত্রত্যাগ, তলপেটের নীচের অংশ ফুলে থাকা ইত্যাদি।

নির্ণয় : জন্মের আগে বা সদ্যজাতর আল্ট্রাসাউন্ড পরীক্ষার PUV'র প্রথম লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়। VCUG পরীক্ষার দ্বারা সঠিকভাবে এই রোগের নির্ণয় করা হয়। এই পরীক্ষা জন্মের কিছুদিনের মধ্যেই করা হয়।

চিকিৎসা : ইউরোলজিস্ট (শল্য চিকিৎসক) এবং কিডনী বিশেষজ্ঞ (নেফ্রোলজিস্ট) যুগ্মভাবে এই রোগের চিকিৎসা করে থাকেন। তৎক্ষণাৎ অবস্থার উন্নতির জন্য প্রাথমিকভাবে মূত্রথলিতে একটি কৃত্রিম নালী (মূত্রদ্বার বা খুব কম ক্ষেত্রে সরাসরি তলপেটের মধ্য দিয়ে) প্রবেশ করানো হয়। অবিরাম মূত্র নিষ্কাশনের জন্য। একইসঙ্গে সংক্রমণের, অ্যানেমিয়ার, কিডনী ফেলিওরের, অপুষ্টির শরীরে তরল বা অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্যের চিকিৎসার মাধ্যম সার্বিক অবস্থার উন্নতি হয়। PUV'র পাকাপাকি চিকিৎসা হল শল্য-চিকিৎসা। ইউরোলজিস্ট এন্ডোস্ক্রোপের সাহায্যে মূত্রদ্বারের ভালভ্ অপসারণ করে থাকেন। ইহার পরে সমস্ত শিশুদের সারা জীবন নেফ্রোলজিস্টের তত্ত্বাবধানে থাকার প্রয়োজন হয় কারণ সংক্রমণ, উচ্চ-রক্তচাপ, অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য, অ্যানেমিয়া এবং ক্রনিক কিডনী ডিসিজ হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

ভেসিকোইউরিটেরাল রিফ্লাক্স (Vesicoureteral Reflux–VUR)

VUR হল মূত্রের মূত্রথলি থেকে মূত্রবাহিনী নালীর দিকে বিপরীত পথে গমন।

VUR'র ব্যাপারে জানা প্রয়োজন কেন?

PUV মূত্রমার্গের নীচের অংশে অবরোধের সৃষ্টি করে বাচ্চা ছেলেদের মধ্যে এবং _CKD_ তে রূপান্তরিত হতে পারে।

মূত্রমার্গের সংক্রমণের ফলে জ্বরে ভোগা শিশুদের ৩০% থেকে ৪০% শিশুদের মধ্যে VUR দেখা যায়। অনেক শিশুদের মধ্যে VUR-এর ফলে কিডনীতে ক্ষতের সৃষ্টি হয় বা কিডনীর ক্ষতি হয়। দীর্ঘদিন ধরে ক্ষতের ফল উচ্চ রক্তচাপ, গর্ভবতী কমবয়সী মহিলাদের মধ্যে হানিকারক রাসায়নিকের মাত্রা বাড়া, ক্রনিক কিডনী ডিসিজ বা পরে কিডনী ফেলিওর হতে পারে। VUR'র সম্ভাবনা বংশানুক্রমে বেশি থাকে এবং মেয়েদের মধ্যে বেশি দেখা যায়।

VUR কি এবং ইহা কেন হয়?

VUR হল মূত্রের অস্বাভাবিকভাবে মূত্রথলি থেকে মূত্রবাহিনী নালী বা কিডনীর দিকে বিপরীত পথে গমন। ইহা একদিকে বা দুদিকে হতে পারে। কিডনীতে সৃষ্টি হওয়া মূত্র নালীর মাধ্যমে মূত্রথলিতে এসে জমা হয় এবং প্রাকৃতিকভাবে কেবলমাত্র একইপথে প্রবাহিত হয়। মূত্রত্যাগের সময় যখন মূত্রথলিতে মূত্র ভর্তি থাকে তখন মূত্রথলি এবং মূত্র বাহিনীর মধ্যের ভালভ্ বিপরীত প্রবাহকে প্রতিরোধ করে। VUR এই ভালভ্-এর ক্রটির কারণেই হয়ে থাকে।

ভেসিকোইউরিটেরাল রিফ্লাক্স

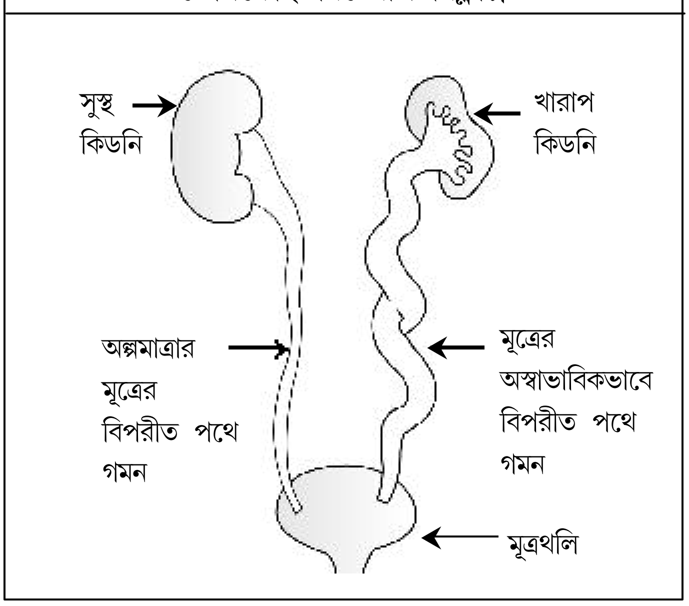

মূত্রথলি থেকে মূত্রবাহিনী নালী বা কিডনী পর্যন্ত মূত্র পৌঁছানার উপর নির্ভর করে VUR-কে কম থেকে বেশি বিপজ্জনক (Grade I to V) হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

VUR-এর কারণ?

দুই ধরণের VUR হতে পারে : মুখ্য VUR বা গৌণ VUR। মুখ্য VUR হল খুব সাধারণ এবং ইহা জন্মের সময় থেকেই বর্তমান থাকে। গৌণ VUR যে কোনো বয়সেই হতে পারে। ইহা সাধারণত মূত্রথলির অবরোধ বা ত্রুটি অথবা মূত্রদ্বার বা মূত্রথলিতে সংক্রমণের ফলে হয়।

VUR-এর লক্ষণ কি?

VUR-এর কোন বিশেষ লক্ষণ নেই। মূত্রমার্গের ঘনঘন এবং বারবার সংক্রমণ হল VUR সবথেকে বড় লক্ষণ। একটু বেশি বয়সের শিশুদের মধ্যে VUR এর লক্ষণ প্রকাশ পায় কারণ উচ্চ রক্তচাপ এবং মূত্রে প্রোটিন আসার মত সমস্যা ঘনীভূত হতে থাকে।

VUR-এর নির্ণয় কিভাবে করা হয়?

VUR এর নির্ণয় নিম্নলিখিত পদ্ধতির মাধ্যমে করা হয়-

১. VUR-এর মৌলিক নির্ণয় :

- Voiding Cystourethrogram–VCUG হল VUR এর নির্ণয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি।
- VUR-এর মাত্রা Reflux (বিপরীত চাপ)-এর উপর নির্ভর করে VUR-এর মান কতটা মূত্র বিপরীত দিকে প্রবাহিত হচ্ছে তার সংকেত দেয়। VUR-এর মাত্রার বিভাজন রোগীকে সঠিক চিকিৎসা প্রদান করার জন্য খুবই দরকারী।
- প্রথম অবস্থার VUR-এ মূত্রের বিপরীত চাপ কেবলমাত্র মূত্র বাহিনীনালীর উপরেই থাকে (Grade-I এর II), VUR-এর বিপজ্জনক অবস্থায় বিপরীত চাপ এতটাই বেশি হয় যে মূত্র বাহিনী নালী এবং কিডনী খুবই ফুলে যায় (Grade-V)।

২. VUR-এর নির্ণয়ের অন্যান্য পরীক্ষা :

- মূত্রের পরীক্ষা এবং মূত্রের কালচার—করা হয় মূত্রমার্গের সংক্রমণ নির্ণয়ের

VUR মূত্র মার্গের সংক্রমণযুক্ত বাচ্চাদের মধ্যে সাধারণত দেখা যায় এবং ইহার ফল উচ্চরক্তচাপ বা _CKD_ হতে পারে

জন্য।

- রক্তের পরীক্ষা : সরল পরীক্ষা যেমন লোহিত ও শ্বেত রক্ত কণিকা (RBC, WBC)-এর সিরাম ক্রিয়েটিনিন।
- কিডনী এবং মূত্রথলির আল্ট্রাসাউন্ড : কিডনীর আকার, ক্ষত পাথর, অবরোধ বা অন্যান্য ত্রুটির নির্ণয়ের জন্য। ইহা বিপরীত চাপ (Reflux) নির্ণয় করতে পারে না।
- DMSA কিডনী স্ক্যান : এই পরীক্ষা হল কিডনীর ক্ষত নির্ণয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি।

VUR-এর চিকিৎসা কিভাবে করা হয়?

VUR-এর চিকিৎসা মূত্রমার্গের সংক্রমণ এবং কিডনীর ক্ষতি প্রতিরোধ করার জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। VUR-এর চিকিৎসা VUR-এর মাত্রা, শিশুর বয়স এবং লক্ষ্মণের উপর নির্ভর করে। VUR-এর তিনটি প্রধান চিকিৎসাপদ্ধতি হল অ্যান্টিবায়োটিক, শল্যচিকিৎসা এবং এন্ডোস্কোপিক চিকিৎসা। VUR-এর প্রথম সারির চিকিৎসা হল অ্যাটিবায়োটিক-এর ব্যবহারী মূত্রমার্গে সংক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য। গুরুতর VUR-এর
ক্ষেত্রে যেখানে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করে সুফল পাওয়া যায়নি
সেখানে শল্যচিকিৎসা বা এন্ডোস্কোপিক চিকিৎসাপদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

অল্পমাত্রার VUR : অল্পমাত্রার VUR নিজের থেকেই ঠিক হয়ে যায়, শিশুর ৫ বা ৬ বছর বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গে। এইরকম শিশুদের ক্ষেত্রে শল্যচিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। এক্ষেত্রে অল্পমাত্রার অ্যান্টিবায়োটিক দিনে একবার বা দুবার করে দীর্ঘদিন সেবন করতে বলা হয় যাতে মূত্রমার্গের সংক্রমণ না হয়। ইহাকে বলে অ্যান্টিবায়োটিক দ্বারা প্রতিরোধ। এই চিকিৎসা সাধারণত ৫ বছর বয়স পর্যন্তই করা হয়। মনে রাখা দরকার যে, অ্যান্টিবায়োটিক VUR কে ঠিক করে না। Nitrofurantion এবং Cotrimoxazole প্রতিরোধী চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা হয়।

নিয়মিত মূত্রের পরীক্ষার মাধ্যমে মূত্রমার্গের সংক্রমণের নির্ণয় করা হয়। VCUG-এর আল্ট্রাসাউন্ড নিয়মিতরূপে করা হয়, Reflux কমেছে কি না তা দেখার জন্য।

দীর্ঘদিন ধরে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের মাধ্যমে অল্পমাত্রার *Reflux* কে নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং শল্যচিকিৎসা এড়ানো সম্ভব।

গুরুতর VUR : ইহা নিজের থেকে কমে যাবার সম্ভাবনা খুব কম। সুতরাং, এইধরনের রোগী শিশুদের শল্যচিকিৎসা বা এন্ডোস্কোপিক চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।

বিপরীত চাপের (Reflux)-এর সংশোধন শল্যচিকিৎসার মাধ্যমে (Ureteral reimplantation বা Ureteroneocystostrony) করা হয়। শল্য চিকিৎসার প্রধান সুবিধা হল অধিক সফলতার সম্ভাবনা (৮৮-৯৯%)

এন্ডোস্কোপিক চিকিৎসা হল দ্বিতীয় ফলপ্রসূ চিকিৎসা। এই চিকিৎসার সুবিধা হল ইহা বর্হিবিভাগেই (OPD) করা সম্ভব। কেবলমাত্র ১৫ মিনিট সময় লাগে, বিপদের সম্ভাবনা কম সম্ভব এবং কাটাছেঁড়ার প্রয়োজন হয় না। ইহা সাধারণত অজ্ঞান করেই করা হয়। এই পদ্ধতিতে এন্ডোস্কোপের (প্রজ্জ্বলিত নালী) সাহায্যে একটি বিশেষ ভারী (Bulking Agent–eg. Dexteanomer/hyaluronic acid Copolymer–Deflux) প্রবেশ করানো হয় যেখানে মূত্রবাহিনী নালী মূত্রথলীতে প্রবেশ করে, সেই সংযোগস্থলে। এই বিশেষ পদার্থ মূত্রবাহিনী নালীর সংযোগস্থলের প্রতিরোধ বাড়ায় যার ফলে মূত্র বিপরীত দিকে প্রবাহিত হতে পারে না। এই পদ্ধতির সফলতার হার হল ৮৫ থেকে ৯০%। এন্ডোস্কোপিক চিকিৎসাপদ্ধতি অল্পমাত্রার VUR-এর ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যেতে পারে কারণ ইহার ফলে দীর্ঘদিন অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহারকে এড়ানো সম্ভব।

VUR-এর রোগী সমস্ত শিশুকে দীর্ঘদিন ধরে উচ্চতার, ওজনের, রক্তচাপের, মূত্রের পরীক্ষার মাধ্যমে চিকিৎসকের নিয়ন্ত্রণে রাখা দরকার।

চিকিৎসকের সঙ্গে কখন পরামর্শ করা দরকার?

মূত্রমার্গের সংক্রমণের রোগী শিশুদের জন্য চিকিৎসকের সঙ্গে তখনই পরামর্শ করা দরকার যখন-

- দীর্ঘক্ষণ ধরে জ্বর, কাঁপুনি, মূত্রত্যাগের জ্বালা বা যন্ত্রণা, মূত্রে অত্যাধিক দুর্গন্ধ বা রক্ত দেখতে পাওয়া যায়।
- গা-বমি ভাব যার ফলে তরল বা ওষুধ না খেতে পারা।
- তরল পদার্থ না খেতে পারার ফলে শরীরে জলের অভাব।
- কোমরের বা তলপেটের যন্ত্রণা।
- ক্ষুধামান্দ্য, খিটখিটে মেজাজ ইত্যাদি।

নিয়মিতরূপে *VUR* এর রোগীদের চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার যাতে কিডনীর ক্ষতি প্রতিরোধ সম্ভব।

অধ্যায় ২৬.
বিছানায় প্রস্রাব করা

বিছানায় প্রস্রাব করা হল একটি অনিচ্ছাকৃত মূত্রত্যাগ (ঘুমের মধ্যে) যা সাধারণত শিশুদের মধ্যেই দেখা যায়। বিছানায় প্রস্রাব করা (Nocturnal Enuresis) কিডনি খারাপ, অলসতা বা শিশুদের দুষ্টুমির ফল নয়। বেশিরভাগ শিশুরই এই সমস্যা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের থেকেই ঠিক হয়ে যায়। তথাপি এই সমস্যা শিশু বা তার পরিবারের কাছে চিন্তার কারণ যেহেতু এটি একটি অসুবিধার বা লজ্জার কারণ।

কত শতাংশ শিশু এই সমস্যায় ভোগে এবং কত বছর বয়সের মধ্যে এটি বন্ধ হয়ে যায়?

বিছানায় প্রস্রাব করার সমস্যা শিশুদের ৬ বছর বয়স পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। ৫ বছর বয়স্ক ১৫ থেকে ২০% শিশুদের মধ্যে এই সমস্যা দেখা যায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্যা কমতে থাকে - ১০ বছর বয়সের কেবলমাত্র ৫%, ১৫ বছর বয়স্কদের ২%, এবং প্রাপ্তবয়স্কদেব ১% এরও কম।

কোন ধরনের শিশুরা এই সমস্যায় বেশি ভোগে?

- যে সমস্ত শিশুদের বাবা-মা এই সমস্যার শিকার ছিলেন।
- যে সমস্ত শিশুদের স্নায়বিক গঠন স্বাভাবিক হয় না, তারা মূত্রথলির সম্পূর্ণতা অনুধাবন করতে অসমর্থ থাকে।
- যারা খুব গভীরভাবে ঘুমোয়।
- মেয়েদের থেকে ছেলেদের মধ্যে এই সমস্যা অধিক দেখা যায়।
- এই সমস্যা শারীরিক বা মানসিক চাপের ফলেও দেখা যেতে পারে।
- খুব কম সংখ্যক শিশুদের মধ্যে এই রোগ (২.৩% শিশু) মূত্রমার্গের সংক্রমণ, মধুমেহ, কিডনি ফেলিওর, ফিতাকৃমি, কোষ্ঠকাঠিন্য, ছোট মূত্রথলি, মেরুদন্ডের ত্রুটি বা ছেলেদের ইউরিথ্রাল ভাল্বের ত্রুটির ফলস্বরূপ দেখা যেতে পারে।

এই সমস্যার নির্ণয়ের জন্য শিশুদের কী কী পরীক্ষা করা হয়?

যে সমস্ত শিশুদের মধ্যে কিছু ডাক্তারি বা গঠনমূলক ত্রুটি সন্দেহ করা হয়,

বিছানায় প্রস্রাব করার সমস্যা শিশুদের খুবই সাধারণ সমস্যা, কিন্তু এটি কোনও রোগ নয়।

কেবলমাত্র তাদেরই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। সর্বাধিক প্রচলিত পরীক্ষাগুলি হল মূত্রের পরীক্ষা, রক্তের শর্করার পরীক্ষা, মেরুদন্ডের এক্স-রে বা আল্ট্রাসাউন্ড বা অন্যান্য পরীক্ষা।

চিকিৎসা

বিছানায় প্রস্রাব করার সমস্যা পুরোপুরি অনিচ্ছাকৃত, সুতরাং শিশুকে শাস্তি দেওয়া, প্রহার করা বা তার উপরে চিৎকার করা উচিত নয়। তার বদলে শিশুকে এই আশ্বাস দেওয়া দরকার যে এই সমস্যা ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যাবে।

প্রাথমিক চিকিৎসা হল, শিক্ষা, প্রেরণা এবং তরল গ্রহণ বা ত্যাগের সময়ের পরিবর্তন করা। যদি এই সবের পরেও অবস্থার উন্নতি না হয় তাহলে রাত্রে অ্যালার্ম লাগিয়ে প্রস্রাব করানোর (এক বা একাধিক বার) বা ওষুধ সেবনের ব্যবস্থা করা দরকার।

১. শিক্ষামূলক এবং প্রেরণাদায়ক চিকিৎসা

- শিশুকে বিছানায় প্রস্রাব করার সমস্যার ব্যাপারে পুরোপুরি অবগত করানো দরকার।
- এই সমস্যাতে শিশুর কোনও দোষ নেই, সুতরাং শিশুর উপরে রাগ দেখানো উচিত নয়। এতে অবস্থার অবনতি হয়।
- এ ব্যাপারে নজর রাখা দরকার যে শিশুকে কেউ যেন এই কারণে উত্ত্যক্ত না করে।
- শিশুকে মানসিক চাপ থেকে মুক্ত করা দরকার এবং এর সব থেকে ভাল পদ্ধতি হল শিশুকে বোঝানো যে পরিবারের সকলেই তার প্রতি সহানুভূতিশীল এবং এই সমস্যা দীর্ঘদিন থাকবে না।
- রাত্রে ঘরে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকা যাতে বাথরুম পর্যন্ত যেতে কোনও অসুবিধা না হয়।
- শিশুর পোশাক, বিছানার চাদর, তোয়ালে ইত্যাদি রাখা দরকার যাতে রাত্রে প্রয়োজনে হাতের কাছে পাওয়া যায়।
- বিছানার উপর প্লাস্টিকের চাদরের (অয়েল ক্লথ) ব্যবস্থা করা যাতে বিছানার ক্ষতি না হয়।
- প্রতিদিন সকালে স্নান করানো, যাতে মূত্রের গন্ধ না থাকে শরীরে।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, সহানুভূতিশীল ব্যবহার এবং প্রেরণাদায়ক ব্যবহার এই সমস্যার থেকে মুক্তি দিতে পারে।

- যেদিন রাত্রে শিশু প্রস্রাব না করে থাকে বিছানায়, তার পরের দিন শিশুর প্রশংসা করা দরকার এবং ছোট উপহার দিলে শিশুকে পরোক্ষভাবে বিছানায় প্রস্রাব না করতে উৎসাহিত করা হয়।
- কোষ্ঠকাঠিন্যকে অবহেলা করা উচিত নয়, এর চিকিৎসা করানো দরকার।

২. তরল গ্রহণ নিয়ন্ত্রণ করা

- রাত্রে শুতে যাবার দুই থেকে তিন ঘন্টা আগে তরল খাবার গ্রহণ নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। কিন্তু দিনের বেলায় পর্যাপ্ত তরল গ্রহণ করা দরকার।
- সন্ধেবেলায় চা, কফি, কোলা এবং চকোলেট না খাওয়াই ভাল। এইসব খাবার মূত্রত্যাগের এবং পরোক্ষভাবে বিছানায় প্রস্রাব করার প্রবণতাকে বাড়ায়।

৩. মূত্রত্যাগের অভ্যাস করানো

- বিছানায় শুতে যাবার আগে দু-বার মূত্র ত্যাগের অভ্যাস করানো দরকার। একবার শুতে যাবার সময়ের কিছু পূর্বে এবং একবার শুতে যাবার ঠিক আগে।
- পুরো দিনে নির্দিষ্ট সময় অন্তর মূত্রত্যাগের অভ্যাস করানো দরকার।
- রাত্রে শিশু ঘুমানোর পরে তিন ঘন্টা পরে একবার জাগিয়ে মূত্রত্যাগ করানো দরকার।
- রাত্রে বিছানায় প্রস্রাবের করার সময়ের উপর ভিত্তি করে জাগিয়ে মূত্রত্যাগের সময় ঠিক করা দরকার।

৪. প্রস্রাব অ্যালার্ম (Bedwetting Alarm)

- প্রস্রাব অ্যালার্ম হল বিছানায় প্রস্রাব নিয়ন্ত্রণ করার সর্বাধিক ফলপ্রসু পদ্ধতি। এই পদ্ধতি সাধারণত 7 বছরের অধিক বয়স্ক শিশুদের জন্যই ব্যবহার করা হয়।
- এই পদ্ধতিতে একটি সেন্সর (sensor) শিশুর অন্তর্বাসের সঙ্গে যুক্ত করে রাখা হয়। যখন শিশু মূত্র ত্যাগ করে তখন এই সেন্সর মূত্রের প্রথম ফোঁটাকে অনুধাবন করে অ্যালার্ম বাজাতে থাকে ফলে শিশু জেগে যায়। শিশু বাকি মূত্র বাথরুমে গিয়ে ত্যাগ করতে পারে।
- এই অ্যালার্ম শিশুকে ঠিক প্রস্রাব করার পূর্বে জেগে ওঠার অভ্যাসের প্রশিক্ষণ

শরীরে তরলের গ্রহণের নিয়ন্ত্রণ বিছানায় শুতে যাবার আগে রাত্রে এবং নিয়মিত মূত্রত্যাগের অভ্যাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ

দেয়।

৫. মূত্রথলির প্রশিক্ষকের অভ্যাস

- অনেক শিশু যারা এই সমস্যায় ভোগে, তাদের মূত্রথলির আকার ছোট হয়। মূত্রথলির প্রশিক্ষণের অভ্যাসের উদ্দেশ্য হল মূত্রথলির সাধারণ ক্ষমতা বাড়ানো।
- দিনের বেলায় শিশুকে অধিক মাত্রায় জলপান করতে বলা হয় এবং মূত্রত্যাগের বেগ আসা সত্ত্বেও মূত্রত্যাগ করতে মানা করা হয়।
- এই অভ্যাসের ফলে শিশু মূত্র দীর্ঘ সময় পর্যন্ত শরীরে ধরে রাখতে পারে। এর কারণ এই পদ্ধতি মূত্রথলির মাংসপেশীর ক্ষমতা বাড়ায় এবং মূত্রথলির মূত্রধারণ ক্ষমতা বাড়ায়।

৬. ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা

ওষুধ সব থেকে শেষে প্রয়োগ করা হয় এবং সাত বছরের কম বয়সের শিশুদের উপর ব্যবহার করা হয় না। এই পদ্ধতি ফলপ্রসূ কিন্তু বিছানায় প্রস্রাব করার সমস্যা পুরোপুরি ঠিক করতে পারে না।

এটি একটি সাময়িকভাবে অবলম্বিত পদ্ধতি এবং ইহা অল্প সময়ের জন্যই ব্যবহার করা হয়। বিছানায় প্রস্রাব করা আবার পুনরায় শুরু হয়ে যায় যখনই ওষুধ সেবন বন্ধ করা হয়। এই রোগ প্রস্রাব অ্যালার্ম (Bedwetting Alarm) এর সাহায্যেই পুরোপুরি ঠিক হওয়া সম্ভব।

অ. ডেসমোপ্রেসিন অ্যাসিটেট (Desmopressin Acetate DDAVD) : এই ওষুধ ব্যবহারে খাওয়া যায় এবং ইহা তখনই ব্যবহার করা হয় যখন অন্যান্য পদ্ধতি অসফল হয়।

এই ওষুধ রাত্রে মূত্র সৃষ্টির পরিমান কম করে দেয়। সুতরাং এই ওষুধ শুধুমাত্র শিশুদের ক্ষেত্রেই ফলপ্রসূ যাদের শরীরে অনেক বেশি পরিমাণ মূত্রের সৃষ্টি হয়। যেমন শিশু এই ওষুধ সেবন করছে তাদের তরল গ্রহণ কম করা দরকার। বিশেষত সন্ধেবেলায়। এই ওষুধ সাধারণত বিছানায় শুতে যাবার আগে সেবন করতে বলা হয়। যদি কোনও কারণে শিশু সন্ধে বা রাত্রে বেশি জলপান করে থাকে, তা হলে এই ওষুধ সেবন করা উচিত নয়।

যদিও এই ওষুধ খুবই ফলপ্রসূ তবুও এই ওষুধে কিছু বিপরীত প্রতিক্রিয়া বা

> ***Bedwetting Alarm* ও ওষুধের ব্যবহার সাধারণত ৭ বছরের অধিক বয়সের শিশুদের উপরেই ব্যবহার করা হয়।**

কু-প্রভাব আছে। এই ওষুধের দাম বেশি হবার কারণে বেশিরভাগ রোগী এই ওষুধ কিনতে পারেন না।

আ. ইমিপ্রামিন (Imipramin trycyclic antidepressants) :

এই ওষুধ মূত্রথলিকে শিথিল এবং ভালভকে শক্ত করে, যার ফলে মূত্রথলির মূত্রধারণের ক্ষমতা বাড়ে। এই ওষুধ সাধারণত ৩ থেকে ৬ মাসের জন্যই ব্যবহার করা হয়। এই ওষুধের শীঘ্র কাজ করার ক্ষমতা থাকার জন্য। এই ওষুধ শুতে যাবার একঘন্টা অগে সেবন করার পরামর্শ দেওয়া হয়। এই ওষুধ খুবই ফলপ্রসূ কিন্তু কু-প্রভাব বেশি থাকার কারণে এই ওষুধ নিয়ন্ত্রণের সাথে ব্যবহার করা হয়।

ই. অক্সিবিউটিনিন (Oxybutynin) :

Oxybutynin (Anticholinergic drugs) খুবই ফলপ্রসূ দিনের বেলায় বিছানায় প্রস্রাব করা বন্ধ করার জন্য। এই ওষুধ মূত্রথলির সংকোচন ক্ষমতা কমায় ফলে মূত্রধারণের ক্ষমতা বাড়ে। কু-প্রভাব হল গলা শুকিয়ে যাওয়া, কোষ্ঠ কাঠিন্য, ইত্যাদি।

বিছানা প্রস্রাব করার সমস্যার শিকার শিশুদেরকে কখন ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার?

- যদি দিনের বেলাতে বিছানায় প্রস্রাব করে শিশু।
- এই সমস্যা যদি ৭ বা ৮ বছর বয়সের পরেও থাকে।
- যদি এই সমস্যা বন্ধ হয়ে যাবার পরে ৬ মাস পরে আবার সমস্যার শুরু হওয়া।
- যদি শিশুর মলত্যাগের উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকে।
- যদি শরীরে জ্বর থাকে, ঘনঘন মূত্র ত্যাগ বা জ্বলন, অসাধারণ তেষ্টা পাওয়া, মুখ বা পা ফোলে।
- মূত্রত্যাগের ধারা ক্ষীণ হওয়া বা মূত্রত্যাগে কষ্ট হওয়া।

ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা হল সাময়িকভাবে অবলম্বিত পদ্ধতি কিন্তু ইহা সমস্যাকে পুরোপুরি ঠিক করতে পারে না।

অধ্যায় ২৭.
ক্রনিক কিডনী ডিসিজের রোগীদের খাদ্য-পানীয়

কিডনীর প্রধান কাজ হল রক্তের থেকে অপ্রয়োজনীয় পদার্থ দূর করা এবং রক্তের পরিশেশধন করা। এছাড়াও কিডনী অতিরিক্ত জল, খনিজ পদার্থ, রাসায়নিক দূর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জল, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ফসফরাসের এবং বাইকার্বনেটের মত পদার্থের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করাও কিডনীরই কাজ।

ক্রনিক কিডনী ডিসিজের (CKD) রোগীদের এই ভারসাম্যের প্রক্রিয়াটি সুচারুভাবে না হবার আশঙ্কা থাকে। এর ফলে সাধারণ মাত্রার জলপান বা লবণ ও পটাসিয়াম গ্রহণ করা সত্ত্বেও শরীরে তরল বা আয়নের ভারসাম্য বজায় থাকে না।

ক্ষতিগ্রস্ত কিডনীর উপর চাপ কমানোর জন্য এবং শরীরে তরল বা আয়নের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য ক্রনিক কিডনী ডিসিজের রোগীদের খাদ্য-পানীয়ের পরিবর্তন করা দরকার। CKD রোগীদের জন্য কোনও নিদিষ্ট খাদ্যতালিকা নেই। রোগীর শারিরীক অবস্থা, কিডনী ফেলিওরের স্টেজ এবং অন্যান্য সমস্যার উপর নির্ভর করে প্রত্যেক রোগীকে আলাদা-আলাদা উপদেশ দেওয়া হয়। এই উপদেশ বা পরামর্শ পরে সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হতে থাকে।

CKD-এর রোগীদের খাদ্য-পানীয়র নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য হল :

১. ক্রনিক কিডনী ডিসিজের অগ্রগতিকে মন্থর করা এবং ডায়ালিসিসের প্রয়োজনকে দূরে রাখা।
২. রক্তে অতিরিক্ত ইউরিয়ার বিষপূর্ণ (Toxic) প্রভাবকে কম করা।
৩. সঠিক পুষ্টি এবং শরীর দূর্বল হওয়ার থেকে দূরে রাখা।
৪. তরল বা আয়নের ভারসাম্যহানীর আশঙ্কার থেকে দূরে থাকা।
৫. হৃদরোগকে প্রতিরোধ করা।

CKD-এর রোগীদের খাদ্য-পানীয়র নিয়ন্ত্রণের সাধারণ নীতি

- শরীরে পর্যাপ্ত শক্তির জোগান দেবার জন্য শর্করা (Carbohydrate) এবং চর্বিজাতীয় (Fat) পদার্থের মাধ্যমে পর্যাপ্ত ক্যালোরির জোগান দেওয়া।
- সর্বাধিক প্রোটিন গ্রহণ ০.৮ gm. প্রতি Kg শরীরের ওজন প্রতিদিন রাখা।
- মধ্যম মাত্রাতে চর্বিজাতীয় পদার্থের জোগান দেওয়া। তেল, ঘি বা Trans-

Fat গ্রহণ কম করা।

- শরীরের ফোলা কম করার জন্য জল বা তরল গ্রহণ নিয়ন্ত্রণ।
- সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ফসফরাসের গ্রহণ নিয়ন্ত্রণ।
- পর্যাপ্ত ভিটামিন এবং ট্রেস্-এলিমেন্টর জোগান দেওয়া। অধিক ফাইবারযুক্ত খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

CKD-এর রোগীদের খাদ্য-পানীয়ের নির্বাচন বা পরিবর্তনের বিস্তৃত বিবরণ : ডায়ালিসিস শুরু হবার পরে অধিক প্রেটিনযুক্ত খাবারের পরামর্শ দেওয়া হয়। CAPD-এর রোগীদের খাদ্যতালিকাতে অধিক প্রোটিন অবশ্যই থাকা দরকারা কারণ ডায়ালিসিসের সময় অনেক প্রোটিন শরীর থেকে বেরিয়ে যায়।

১. অধিক ক্যালোরী (Calorie) গ্রহণ

শরীরের দৈনন্দিন কাজকর্মের জন্য, স্বাভাবিক তাপমাত্রা, বৃদ্ধি এবং ওজন ঠিক রাখার জন্য শরীরে ক্যালোরির প্রয়োজন হয়। CKD-এর রোগীদের সাধারণত ৩৫ থেকে ৪০ কিলো ক্যালোরী প্রতি কেজি শরীরের ওজনের হিসাবে প্রতিদিন প্রয়োজন হয়। যদি পর্যাপ্ত ক্যালোরীর জোগান না থাকে তাহলে শরীরের প্রোটিন তার যোগান দেয়। এইভাবে প্রোটিন শরীরের ক্যালোরী জোগানের জন্য ক্ষয় হতে থাকলে শরীর অপুষ্টির শিকার হয় এবং শরীরে অধিক অপ্রয়োজনীয় পদার্থের সৃষ্টি হয়। এই কারণে শরীরে পর্যাপ্ত ক্যালোরীর জোগান থাকা দরকার। ক্যালোরীর হিসাব শরীরের বর্তমান ওজনের উপর না করে, সাধারণভাবে কত প্রয়োজন হবার দরকার তার উপর করার দরকার কারণ বর্তমান অপুষ্টি। ডায়াবিটিসের কারণে ওজন বেশি বা কম হতে পারে।

শর্করা (Carbohydrates)

শর্করাই হল শরীরের প্রয়োজনীয় ক্যালোরীর প্রাথমিক উপাদান। চাল, আটা, আলু, চিনি, মধু, মিষ্টি, শাকসব্জী, ফলমূল ও কেক বা বিস্কুটে শর্করা পাওয়া যায়। মোটা বা ডায়াবিটিসের রোগীদের শর্করা গ্রহণ কম করা দরকার। সম্পূর্ণ শর্করা যা গোটা দানাশস্য যেমন আটা, বিনা পালিশ করা বা ঢেঁকিছাঁটা চাল বা অন্যান্য দানাশস্য যেমন বাজরা, রাগী বা ভুট্টার থেকে পাওয়া যায় এবং যাতে ফাইবার থাকে তা গ্রহণ করা দরকার। এই ধরণের শর্করা বেশি গ্রহণ করা প্রয়োজন। অন্যান্য মিষ্টি কম গ্রহণ করা (সর্বোচ্চ ২০%) দরকার।

ফ্যাট (Fat)

ফ্যাট হল ক্যালোরীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস, যা শর্করা বা প্রোটিনের দুই গুণ

অধিক ক্যালোরী প্রদান করে থাকে। মাংস, বাটার, ঘি থেকে ফ্যাট শরীরে প্রবেশ করে। পলিস্যাচুরেটেড ফ্যাট, স্যাচুরেটেড ফ্যাটের থেকে ভাল। আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট বা ভাল ফ্যাট পাওয়া যায় অলিভ তেল, বাদাম তেল, সূর্যমূখীর তেল, মাছ বা বাদাম থেকে। স্যাচুরেটেড বা খারাপ ফ্যাট শরীরে প্রবেশ করো মাংস, কাঁচা দুধ, বাটার, ঘি, চিজ বা চর্বির থেকে। স্যাচুরেটেড ফ্যাটের গ্রহণ কম করা দরকার কারণ ইহা কোলেসেটেরলের সঙ্গে মিলে হৃদরোগ বা কিডনীর রোগ-এর কারণ হয়।

আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটের মধ্যেই মোনোআনস্যাচুরেটেড এবং পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটের অনুপাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অত্যধিক ওমেগা-৬ পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড (PUFA) এবং খুব বেশি ওমেগা-৬ ও ওমেগা-৩-এর অনুপাত হল ক্ষতিকারক। কিন্তু কম ওমেগা-৬ ও ওমেগা-৩-এর অনুপাত থাকলে তা উপকারী। ভোজ্যতেলের মিশ্রণের মাধ্যমে এই অনুপাত পাওয়া সম্ভব। বনস্পতি, ডালডা, ঘি, আলু-চিপস্, কেক্স, কুকীজ-এর মধ্যে ট্রান্স ফ্যাট থাকে যা খুবই ক্ষতিকারক।

২. প্রোটিন গ্রহণ

শরীরের ক্ষত পূরণ করা এবং শরীরের স্বাভাবিক গঠনপ্রণালী বজায় রাখার জন্য প্রোটিন খুবই দরকারী।

প্রোটিন গ্রহণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কিডনীর কার্যক্ষমতা কমার গতিকে মন্থন করা সম্ভব। কিন্তু অতিরিক্ত প্রোটিন গ্রহণ নিয়ন্ত্রণ ঠিক নয় কারণ CKD-এর রোগীরা এমনিতেই ক্ষুধামান্দ্যে ভোগেন, এবং অপুষ্টির শিকার হতে পারেন। অপুষ্টির ফলে ওজন কমতে পারে, শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে এবং মৃত্যুর আশঙ্কা বেড়ে যায়।

ভারতবর্ষে মানুষ সাধারণত শাক-সব্জী বা নিরামিষ বেশি খান। যারা আমিষ খান, তারাও প্রতিদিন খান না। অর্থনৈতিক হিসাবে গরীব বা বড়লোক এই দুই ধরনের মানুষের ক্ষেত্রেই প্রোটিন গ্রহণ ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর মেডিক্যাল রিসার্চের (ICMR)-এর নামক এক গ্রাম প্রতি কেজি শরীরের ওজনের নিচেই হয়ে থাকে। এই কারণে ০.৮ গ্রাম প্রতি কেজি শরীরের ওজনের হিসাবে প্রোটিন গ্রহণের নিয়ন্ত্রণ শুধুমাত্র CKD-এর শেষের অবস্থাতেই বলা হয়। সুতরাং প্রোটিনের গুণবর্ত্তার উপর জোর দেওয়া হয়। অধিক বায়োলোজিক্যাল ভ্যালুযুক্ত প্রোটিন (০.৪ থেকে ০.৬ গ্রাম/কেজি) যেমন দই, পনির, সোয়াবিন পাউডার, ডিমের সাদা অংশ, মাছ খাওয়া দরকার।

৩. তরল পদার্থ গ্রহণ

CKD-এর সমস্ত রোগীদের তরল গ্রহণ কেন সাবধানতার সাথে করা দরকার?

কিডনী শরীর থেকে অতিরিক্ত জল বের পরে শরীরে তরলের ভারসাম্য বজায় রাখে। কিডনী খারাপ হবার সঙ্গে সঙ্গে মূত্রের পরমাণও কমতে থাকে। মূত্রের পরিমাণ কমে যাব্যার ফলে শরীরে তরলের মাত্রা বাড়তে থাকে এবং মুখ বা পা ফুলতে থাকে এবং উচ্চ রক্তচাপের সৃষ্টি হয়। ফুসফুসে জল জমার ফলে শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট হয়। এই অবস্থার নিয়ন্ত্রণ না থাকলে তা মৃত্যুর কারণ পর্যন্ত হতে পারে।

শরীরে অধিক তরলের উপস্থিতির নিদর্শন কি?

শরীরে ফোলা, তলপেটে জল জমা (Ascites), শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট, শরীরের ওজন বৃদ্ধি ইত্যাদি হল শরীরে তরলের বৃদ্ধির (Fluid Overload) লক্ষণ।

CKD এর রোগীদের তরল গ্রহণের সময় কি কি সাবধানতা গ্রহণ করা দরকার?

শরীরে তরলের পরিমাণ যাতে বেশি বা কম না হয় তার জন্য ডাক্তারবাবুর পরামর্শমতই তরল গ্রহণ করা দরকার। তরল গ্রহণের মাত্রা রোগীর অবস্থা এবং মূত্রের পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

CKD এর রোগীদের কতটা জল খাবার পরামর্শ দেওয়া হয়?

- যদি রোগীর শরীরে ফোলা না থাকে বা মূত্রের পরিমাণ স্বাভাবিক থাকে তাহলে জল খাবার উপর কোনও নিয়ন্ত্রণ রাখা হয় না। কিন্তু CKD-এর রোগীদের কিডনী ঠিক রাখার জন্য বেশি জল খাওয়া প্রয়োজন, তা ভুল ধারণা।
- শরীরে ফোলা থাকলে বা মূত্রের পরিমান কম হলে কম জল খাবার পরামর্শ দেওয়া হয়। শরীরের ফোলা কমানোর জন্য ২৪ ঘন্টাতে যত পরিমান মূত্র ত্যাগ হয় তার থেকে কম জল খাবার পরামর্শ দেওয়া হয়।
- শরীরে তরলের পরিমান যাতে কম বা বেশি না হয় তার জন্য, আগের দিনে যত পরিমান মূত্র ত্যাগ হয়ে থাকে এই সংখ্যার সঙ্গে আরও ৫০০ মিলি জল যোগ করে সেই পরিমান জল খেতে বলা হয়। ৫০০ মিলি জল যোগ করতে বলার কারণ হল এই পরিমাণ জল ঘাম বা শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়।

CKD-এর রোগীদের কেন প্রতিদিন শরীরের ওজন নেওয়া এবং তা লিপিবদ্ধ করে রাখা প্রয়োজন?

শরীরে তরলের মাত্রার পরিমান বা তারা কম বেশির উপর নজর রাখার জন্য রোগীদের প্রতিদিন ওজন নেওয়া দরকার। যদি তরল গ্রহণের পরামর্শকে সঠিকভাবে মানা হয় তাহলে ওজন একই থাকে। হঠাৎ করে ওজন বাড়া শরীর অধিক তরলের উপস্থিতির নিদর্শন। ওজন বাড়ার অর্থ রোগীকে আরও কঠিনভাবে তরল গ্রহণ নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। ওজন কম তরল গ্রহণ বা ডাইইউরেটি্-এর প্রভাবে কমতে পারে।

তরল গ্রহণ নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি :

১. প্রতিদিন ওজন করা এবং ওজন হিসাবে তরলগ্রহণ নিয়ন্ত্রণ করা।
২. ডাক্তারবাবুর পরামর্শ অনুযায়ী জলপান করুন। তরল গ্রহণ শুধুমাত্র জলের উপরই নির্ভর করে না। চা, কফি, দুধ, দই, জুস, আইসক্রিম, কোল্ড ড্রিংকস, সুপ, ডাল ইত্যাদিও তরল গ্রহণের মধ্যেই পড়ে। কিছু ফল যেমন তরমুজ, আঙ্গুর-এর মধ্যেই তরল পদার্থ অধিক থাকে। তরল গ্রহণের পরিমাণ হিসাব করার সময় এগুলি মনে রাখা দরকার।
৩. বেশি লবণ বা মশালাযুক্ত খাবার তৃষ্ণা বাড়ায়, সুতরাং এগুলি কম গ্রহণ করা দরকার।
৪. শুধুমাত্র তৃষ্ণা পেলে তবেই জলপান করা দরকার অন্যথা নয়।
৫. তৃষ্ণা পেলে জল কম পান করুন বা বরফ খান অল্প করে। বরফের মধ্যের জলের পরিমাণও নিয়ন্ত্রণে রাখুন। বরফ অনেক সময় ধরে খেতে থাকুন।
৬. জলপান করার বদলে কুলকুচি করে ফেলে দিন। এর ফলে গলা শোকাবে না। মুখের মধ্যে মিন্ট বা চুইং গাম্ রাখলেও গলা শোকাবে না।
৭. সর্বদা জলপানের জন্য ছোট আকারের গ্লাস ব্যবহার করুন।
৮. খাবার পরে ওষুধ খান, যাতে ওষুধ খাবার জন্য আলাদা করে জল পান করতে না হয়।
৯. নিজেকে কাজের মধ্যে ব্যস্ত রাখুন।
১০.অত্যাধিক ব্লাড-সুগার থাকলে তৃষ্ণা বাড়ে, সেজন্য ব্লাড-সুগার নিয়ন্ত্রণে রাখুন।
১১.গরম জল পান করলে তৃষ্ণা বাড়ে, সেই কারণে সর্বদা ঠারডা জল পান করুন।

প্রতিদিনের তরল গ্রহণের মাত্রা কিভাবে ঠিক করবেন?

- একটি পাত্রে প্রতিদিনের গ্রহণের জল রাখুন এবং সেখান থেকেই পান করুন।
- যখন সেই পাত্রের তরল শেষ হয়ে যায়, তার অর্থ তরল গ্রহণের সর্বাধিক মাত্রা সেই দিনের মত অতিক্রান্ত হয়ে গেছে।

৪. লবণ (সোডিয়াম)-এর নিয়ন্ত্রন

CKD-এর রোগীদের কম সোডিয়াম যুক্ত খাবারের পরামর্শ দেওয়া হয় কেন?

সোডিয়াম শরীরে রক্তের মাত্রা এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রনে রাখার জন্য খুবই দরকারী। কিডনী সোডিয়ামের মাত্রা নিয়ন্ত্রনে সাহায্যে করে। CKD এর রোগীদের কিডনী শরীর থেকে সোডিয়াম বা অধিক তরল দূর করতে পারে না, সুতরাং সোডিয়াম এবং তরলের মাত্রা শরীরে করতে থাকে।

শরীরে সোডিয়ামের মাত্রা বাড়লে তৃষ্ণা, ফোলাভাব, শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট, রক্তচাপ বাড়তে থাকে। এইসব নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য খাদ্যে সোডিয়ামের পরিমান নিয়ন্ত্রনে রাখার দরকার।

সোডিয়াম এবং লবনের মধ্যে পার্থক্য কি?

সোডিয়াম এবং লবন সাধারণত প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। সাধারন লবন হল সোডিয়াম ক্লোরাইড যার মধ্যে ৪০% সোডিয়াম থাকে। লবনই হল সোডিয়ামের প্রধান উৎস। কিন্তু লবনে কেবলমাত্র সোডিয়ামই থাকে, তা নয়। লবন ছাড়াও নিম্নলিখিত পদার্থগুলিতে সোডিয়ামের পাওয়া যায়—

- সোডিয়াম আলজিনেট ঃ আইসক্রিম, চকোলেটে থাকে।
- সোডিয়াম বাইকার্বনেট ঃ বেকিং পাউডার বা খাবার সোডা।
- সোডিয়াম বেনজোয়েট ঃ শসেতে প্রিজারভেটিভ হিসাবে ব্যবহার করা হয়।
- সোডিয়াম সিট্রেট ঃ পানীয় এবং মিষ্টান্নের সুগন্ধপ্রদানের জন্য ব্যবহার করা হয়।
- সোডিয়াম নাইট্রেট ঃ মাংসের প্রক্রিয়াকরনে ব্যবহার করা হয়।
- সোডিয়াম স্যাকারাইট ঃ কৃত্রিম মিষ্টি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
- সোডিয়াম সালফেট ঃ শুকনো ফলের রং বদলানোকে প্রতিহত করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

উপরোক্ত বস্তুগুলির স্বাদ নোনতা নয়, কিন্তু সোডিয়ামযুক্ত।

কতটা লবন খাওয়া প্রয়োজন?

সাধারণ ভারতবাসীরা প্রতিদিন ৬ থেকে ৮ গ্রাম লবন গ্রহন করে থাকে। CKD

এর রোগীরা ডাক্তারবাবুরা পরামর্শ অনুসারী তরল গ্রহন করবেন। উচ্চ রক্তচাপ এবং শরীরে ফোলা থাকা রোগীদের তিন গ্রামের বেশি লবন গ্রহন করা উচিত নয়।

কোন কোন খাবারে সোডিয়াম বেশি থাকে?

১. সাধারণ লবন, বেকিং পাউডার।

২. পাপড়, আচার, চাটনি, শস্, চাট মশলা ইত্যাদি।

৩. বেকারীর খাবার যেমন বিস্কুট, কেক, পিজা, পাঁউরুটি।

৪. খাবার সোডা বা বেকিং সোডা যুক্ত খাবার যেমন-তেলেভাজা, চপ, সিঙ্গারা ইত্যাদি।।

৫. আলুচিপ, পপকর্ন, নোনতা বাদাম, কোল্ডড্রিংকস না খাওয়াই ভাল।

৬. নোনতা বাটার বা চিজ।

৭. নুডল্স, পাস্তা, কর্নফ্লেক ইত্যাদি।

৮. বাঁধাকপি, ফুলকপি, পালংশাক, মুলো, বীট, ধনেপাতা ইত্যাদি।

৯. অ্যান্টাসিড, সোডিয়াম বাইকার্বনেটের মত ওষুধ।

১০.মাছ, মাংস ইত্যাদি।

১১.সামুদ্রিক খাবার যেমন কাঁকড়া, লোবস্টার, শামুক, শুকানো মাছ ও অন্যান্য মসৃন মাছ।

সোডিয়াম গ্রহন নিয়ন্ত্রনের পদ্ধতি

১. খাবারে লবন এবং বেকিং সোডার ব্যবহার কম করা। খাবার লবন ছাড়া বানানো দরকার এবং পরে লবন যোগ করুন ততটাই যতটা ডাক্তারবাবু পরামর্শ দেন।

২. বেশী সোডিয়াম যুক্ত খাবার না খাওয়া।

৩. সবার সাথে একসাথে খাবারে লবন যোগ না করা এবং লবনের পাত্র খাবারের টেবিলে না রাখা। সালাড, ভাত বা অনান্য খাবারে লবন যোগ করে খাবার অভ্যাস ত্যাগ করা।

৪. বাজার থেকে প্যাকেট করা খাবার, খাবার আগে প্যাকেটের উপর কেবলমাত্র লবণের মাত্রাই নয়, সোডিয়ামের মাত্রাও লক্ষ্য করে তবেই খাওয়া দরকার। কম লবন বা কম সোডিয়ামযুক্ত খারাবকে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন।

৫. ওষুধে সোডিয়ামের মাত্রা লক্ষ্য করুন।

৬. বেশি সোডিয়ামযুক্ত শাক-সবজী গরম করে জলে ফেলে দিন।

৭. কম লবনযুক্ত খাবার সুস্বাদু বানানোর জন্য খাবারে পেঁয়াজ, রসনু, লেবু,

আচার, তেঁতুল জল, ভিনিগার, এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গ, কেসর, কাঁচা লঙ্কা, গোলমরিচ, জিরে ইত্যাদি যোগ করা যেতে পারে।

৮. লবণের বিকল্প কোনও জিনিসের ব্যবহার করা উচিত নয় করেন এই সব জিনিসের মধ্যে অধিক মাত্রায় পটাশিয়াম থাকে।

৯. মৃদু জল (Softened Water) পান করা উচিত নয়, কারন জল মৃদু করার সময় ক্যালসিয়ামের পরিবর্তে সোডিয়াম জলে চলে আসে। রিভার্স অসমোসিস্ (Reverse Osmosis-RO) পদ্ধতিতে পরিশ্রুত জলে সোডিয়াম্ সমেত সমস্ত খনিজ পদার্থ কম থাকে।

১০.রেঁস্তোরাতে খাবার সময়, কম সোডিয়ামযুক্ত খাবার খান।

৫. খাদ্যে পটাশিয়ামের নিয়ন্ত্রন

CKD এর রোগীদের খাদ্যের পটাশিয়াম নিয়ন্ত্রন করতে বলা হয় কেন?

পটাশিয়াম হল মানব শরীরের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থ। শরীরে হৃদযন্ত্রের সচল থাকার জন্য, মাংসপেশীর এবং স্নায়ুতন্ত্রের কার্যক্ষমতা বজায় রাখার জন্য পটাশিয়াম প্রয়োজনীয়। সাধারণত শরীরে খাবারের মধ্য দিয়ে পটাশিয়াম শরীর থেকে নিষ্কাশিত হয়। কিডনীর রোগীদের ক্ষেত্রে পটাশিয়ামের নিষ্কাশন পর্যাপ্ত হয় না। ফলে শরীরে পটাশিয়ামের মাত্রা বাড়তে থাকে (এই অবস্থাকে বলা হয় Hyperkalemia)। হাইপারফ্যালিমিয়া পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিসের রোগীদের মধ্যে কম দেখা যায়। হিমোডায়ালিসিসের রোগীদের তুলনায়।

রক্তের অধিক মাত্রার পটাশিয়াম মাংসপেশীকে দুর্বল করে এবং হৃদযন্ত্রের ছন্দের বিঘ্ন ঘটায়। যা মারাত্মক। যদি পটাশিয়ামের মাত্রা অত্যাধিক বেড়ে যায় তাহলে হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে গিয়ে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। এই অবস্থার লক্ষন বিশেষ প্রকাশ পায় না। সেজন্য ইহাকে নীরব ঘাতক (Silent Killer) বলা হয়। সুতরাং, অত্যাধিক পটাশিয়ামের ফলে উদ্ভুত ক্ষতির থেকে বাঁচার জন্য CKD-এর রোগীদের খাদ্যে পটাশিয়াম নিয়ন্ত্রন করা প্রয়োজন। রক্তের স্বাভাবিক পটাশিয়ামের মাত্রা কত? কখন এই মাত্রাকে অধিক বলে ধরা হয়?

- রক্তের নরমাল পটাশিয়ামের মাত্রা হল ৩.৫ Eq/L থেকে ৫.০ mEq/L.
- যখন রক্তের পটাশিয়ামের মাত্রা ৫.০ থেকে ৬.০ mEq/L হয়, তখন খাদ্যতালিকাতে পরিবর্তন করা দরকার।
- যখন পটাশিয়ামের মাত্রা ৭.০ mEq/L এর বেশি হয় তখন তা মৃত্যুর কারন হতে পারে, এবং এই অবস্থার তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা প্রয়োজন।

পটাসিয়ামের মাত্রা অনুসারে খাদ্যবস্তুর বিভাজন রক্তে সঠিক পটাশিয়ামের মাত্রা বজায় রাখার জন্য, ডাক্তারবাবুর পরামর্শমত খাদ্য তালিকার পরিবর্তন করা দরকার। খাদ্যের পটাশিয়ামের মাত্রার উপর নির্ভর করে খাদ্যবস্তুকে তিনভাগে ভাগ করা হয়-

অধিক পটাশিয়ামযুক্ত = প্রতি ১০০ গ্রাম খাবারে ২০০ মি.গ্রা. এর বেশি
মধ্যম পটাশিয়ামযুক্ত = প্রতি ১০০ গ্রাম খাবারে ১০০ থেকে ২০০ মি.গ্রা.
কম পটাশিয়ামযুক্ত = প্রতি ১০০ গ্রাম খাবারে ১০০ মি.গ্রা. এর কম

অধিক পটাশিয়ামযুক্ত খাবার

- **ফল :** আমলকি, পাকা কলা, চেরি, সবেদা, নারকেল, আতা, আঙ্গুর, লেবু, পাকা আম, মুসাম্বি লেবু, বেঁচিফল ইত্যাদি।
- **শাকসব্জী :** নটেশাক, বেগুন, কচু, ধনেপাতা, সজনেডাঁটা, মাশরুম, পেঁপে কাঁচা, আলু, পালংশাক, রাঙা আলু, সিম।
- **শুকনো ফল :** অ্যালমন্ড, কাজুবাদাম, কিসমিস।
- **দানাশস্য :** বাজরা, রাগী, আটা।
- **ডালশস্য :** বিড়ির ডাল, ছোলার ডাল, মুসুর ডাল, মুগ ডাল।
- **মশলা :** জিরে, ধনে, শুকনো লঙ্কা, মেথি।
- **আমিষ খাবার :** রুই মাছ, পমফ্রেট, চিংড়িমাছ, কাঁকড়া এবং গরুর মাংস।
- **পানীয় :** বোর্নভিটা, ডাবের জল, কফি, মোটা দুধ, চকোলেট, ফলের রস, রসম, সুপ, বিয়ার, ওয়াইন, কোল্ড ড্রিংক্স।
- **অন্যান্য খাবার :** চকোলেট, কেক, আইসক্রিম, আলুচিপ্স, টমাটো শস্।

মধ্যম পটাশিয়ামযুক্ত খাবার

- **ফল :** লিচু, বেদানা, তরমুজ
- **শাকসব্জী :** বীট, কাঁচকলা, করলা, বাঁধাকপি, গাজর, ফুলকপি, ঢেঁড়স, পেঁয়াজ, বিনস্, কুমড়ো, মূলো, টমাটো।
- **দানাশস্য :** বারলি, ময়দা, জোহার, চাল, চিঁড়ে ইত্যাদি।
- **আমিষ খাবার :** কাতলা, মাগুর, চিতল, ইলিশ মাছ ও লিভার।
- **পানীয় :** গরুর দুধ, দই।
- **অন্যান্য খাবার :** কালোজিরে, লবঙ্গ, দারুচিনি, গরম মশলা।

কম পটাশিয়ামযুক্ত খাবার

- **ফল :** আপেল, পেয়ারা, কমলালেবু, পাকা পেঁপে, আনারস, স্ট্রবেরি,

নাশপাতি।

- **শাকসব্জী :** লাউ, ক্যাপসিকাম, শসা, মেথিশাক, রসুন, লেটুসশাক, মটরশুটি, কাঁচা আম, পটল।
- **দানাশস্য :** চাল।
- **ডালশস্য :** সবুজ মটর।
- **আমিষ খাবার :** ডিম, মুরগীর মাংস, ভেড়া ও শুকরের মাংস।
- **অন্যান্য খাবার :** শুকনো আদা, মধু, পুদিনাপাতা, সর্ষে, ভিনিগার।

খাবারের পটাশিয়াম কম করার পদ্ধতি

১. প্রতিদিন কম পটাশিয়ামযুক্ত ফল একটি করে খান।

২. একবারই চা বা কফি খান।

৩. পটাশিয়ামযুক্ত শাকসব্জী নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে পটাশিয়াম কমিয়ে তারপর গ্রহণ করুন।

৪. ডাবের জল, ফলের রস, খাবেন না।

৫. সমস্ত খাবারেই কমবেশি পটাশিয়াম থাকে, তাই কম পটাশিয়ামযুক্ত খাবার চয়ন করা দরকার।

৬. পটাশিয়ামের নিয়ন্ত্রণ শুধুমাত্র প্রি-ডায়ালিসিসের রোগীদের নয়, ডায়ালিসিসের রোগীদেরও করা দরকার।

শাকসব্জীর পটাশিয়াম কিভাবে কমানো সম্ভব?

- খোসা ছাড়িয়ে, ছোটছোট করে কেটে বড় পাত্রে রেখে তার উপর জল ভর্তি করে রাখুন।
- তারপর কাটা সব্জীর টুকরোগুলিকে ঈষৎ উষ্ণ জলে ধুয়ে নিন।
- একটি পাত্রে হাল্কা গরম জল রাখুন এবং শাকসব্জীকে অন্ততঃ একঘন্টা ভিজিয়ে রাখুন (পাত্রে সব্জীর চারগুণ জল রাখুন)
- এইভাবে ভিজিয়ে রাখার পরে, সব্জীর টুকরোগুলিকে গরম জলে দুই থেকে তিনবার গরম জলে ধুয়ে নিন।
- এরপরে শাকসব্জীকে গরম জল ফোটান এবং ফোটানোর পর জল ফলে দিন।
- এইভাবে শাকসব্জীর মধ্যের পটাশিয়ামকে কমানো যায় কিন্তু পুরোপুরি দূর করা যায় না।
- যেহেতু রন্ধনের ফলে শাকসব্জীর ভিটামিনস্ নষ্ট হয় যায়, তাই ডাক্তারবাবুর পরামর্শমত ভিটামিনস্ খাওয়া দরকার।

▲ আলুর থেকে পটাশিয়াম কম করার বিশেষ পদ্ধতি :

- আলুকে খোসা ছাড়িয়ে পাতলা করে কাটুন।
- কাটা আলুর টুকরোগুলিকে ধোবার জন্য অধিক তাপমাত্রার এবং অধিক পরিমাণে জল ব্যবহার করুন।

5. খাবারে ফসফরাস নিয়ন্ত্রন :

- ফসফরাস নামক খনিজ পদার্থটি আমাদের শরীরে হাড়ের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ খাবারের অতিরিক্ত ফসফরাস মূত্রের মাধ্যমে শরীর থেকে নিষ্কাশিত হয়। ফলে রক্তে ফসফরাসের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে। রক্তের ফসফরাসের স্বাভাবিক মাত্রা হল 4.0 থেকে 5.5 mg/dL.
- CKD রোগীদের শরীরে খাবারের মাধ্যমে প্রবেশ করা অতিরিক্ত ফসফরাস্ মূত্রের মাধ্যমে শরীর থেকে নিষ্কাশিত হয় না, ফলে রক্তের ফসফরাসের মাত্রা বাড়তে থাকে। রক্তের বর্ধিত ফসফরাস হাড় থেকে ক্যালসিয়াম বের করতে থাকে যার ফলে হাড় দূর্বল হয়ে যায়।
- বর্ধিত ফসফরাসের ফলে শরীরে চুলকানি হয়, হাড় বা মাংসপেশী দুর্বল হয়, হাড়ে যন্ত্রণা হয়, হাড় শক্ত হয়ে যায় এবং ভেঙ্গে যাবার সম্ভাবনা থাকে। অধিক ফসফরাসযুক্ত খাবার কম করা বা বন্ধ করা উচিত। অধিক ফসফরাসযুক্ত খাবার না বুঝে শুনে গ্রহণ করা দরকার, সেগুলি হল :
- দুধ এবং দুগ্ধজাত খাবার : বাটার, চিজ, চকোলেট, আইসক্রীম, পনির।
- শুকনো ফল : কাজু বাদাম, অ্যালমন্ড, পিস্তা, শুকনো নারকেল।
- গাজর, কচুশাক, ভুট্টা, বাদাম, রাঙা আলু।
- আমিষ খাবার : খাসি ও মুরগীর মাংস, মাছ, ডিম।

7. অধিক পরিমাণে ভিটামিন ও ফাইবার গ্রহণ :

CKD-এর রোগীরা সাধারণত ডায়ালিসিসে যাবার পূর্বেই ভিটামিনের অপুষ্টিতে ভোগেন তার কারণ হল খাবার কম খাওয়া, বিশেষ পদ্ধতিতে অধিক পটাশিয়াম দূর করে রান্না করা ইত্যাদি। কিছু ভিটামিনস—বিশেষভাবে জলে দ্রবীভূত ভিটামিনস্ ডায়ালিসিসের সময় শরীর থেকে বেরিয়ে যায়।

ভিটামিনের এই ক্ষয়কে পূরণ করার জন্য CKD-এর রোগীদের সাধারণত জলে দ্রবীভূত ভিটামিন এবং ট্রেস এলিমেন্টের ওষুধ খাবার পরামর্শ দেওয়া হয়। সুতরাং রোগীদের অধিক ভিটামিনযুক্ত শাকসব্জী ও ফল খাবার পরামর্শ দেওয়া হয়।
প্রতিদিনের খাদ্যতালিকার চয়ন : CKD-এর রোগীদের প্রাত্যহিক খাবারের তালিকা ডায়েটিশিয়ান দ্বারা নেফ্রোলজিস্টের পরামর্শ অনুসারে প্রস্তুত করা হয়।

আলুর থেকে পটাশিয়াম কম করার বিশেষ পদ্ধতি

- আলুকে খোসা ছাড়িয়ে পাতলা করে কাটুন।
- কাটা আলুর টুকরোগুলিকে ধোবার জন্য অধিক তাপমাত্রার এবং অধিক পরিমাণে জল ব্যবহার করুন।

৫. খাবারে ফসফরাস নিয়ন্ত্রন

- ফসফরাস নামক খনিজ পদার্থটি আমাদের শরীরে হাড়ের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ খাবারের অতিরিক্ত ফসফরাস মূত্রের মাধ্যমে শরীর থেকে নিষ্কাশিত হয়। ফলে রক্তে ফসফরাসের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে। রক্তের ফসফরাসের স্বাভাবিক মাত্রা হল ৪.০ থেকে ৫.৫ mg/dL.
- CKD রোগীদের শরীরে খাবারের মাধ্যমে প্রবেশ করা অতিরিক্ত ফসফরাস্ মূত্রের মাধ্যমে শরীর থেকে নিষ্কাশিত হয় না, ফলে রক্তের ফসফরাসের মাত্রা বাড়তে থাকে। রক্তের বর্ধিত ফসফরাস হাড় থেকে ক্যালসিয়াম বের করতে থাকে যার ফলে হাড় দূর্বল হয়ে যায়।
- বর্ধিত ফসফরাসের ফলে শরীরে চুলকানি হয়, হাড় বা মাংসপেশী দুর্বল হয়, হাড়ে যন্ত্রণা হয়, হাড় শক্ত হয়ে যায় এবং ভেঙ্গে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

অধিক ফসফরাসযুক্ত খাবার কম করা বা বন্ধ করা উচিত। অধিক ফসফরাসযুক্ত খাবার বুঝে শুনে গ্রহণ করা দরকার, সেগুলি হল?

- দুধ এবং দুগ্ধজাত খাবার : বাটার, চিজ, চকোলেট, আইসক্রীম, পনির।
- শুকনো ফল : কাজু বাদাম, অ্যালমন্ড, পিস্তা, শুকনো নারকেল।
- গাজর, কচুশাক, ভুট্টা, বাদাম, রাঙা আলু।
- আমিষ খাবার : খাসি ও মুরগীর মাংস, মাছ, ডিম।

৭. অধিক পরিমাণে ভিটামিন ও ফাইবার গ্রহণ

CKD-এর রোগীরা সাধারণত ডায়ালিসিসে যাবার পূর্বেই ভিটামিনের অপুষ্টিতে ভোগেন তার কারণ হল খাবার কম খাওয়া, বিশেষ পদ্ধতিতে অধিক পটাশিয়াম দুর করে রান্না করা ইত্যাদি। কিছু ভিটামিনস—বিশেষভাবে জলে দ্রবীভূত ভিটামিনস্ ডায়ালিসিসের সময় শরীর থেকে বেরিয়ে যায়।

ভিটামিনের এই ক্ষয়কে পূরণ করার জন্য CKD-এর রোগীদের সাধারণত জলে দ্রবীভূত ভিটামিন এবং ট্রেস এলিমেন্টের ওষুধ খাবার পরামর্শ দেওয়া হয়। সুতরাং রোগীদের অধিক ভিটামিনযুক্ত শাকসব্জী ও ফল খাবার পরামর্শ দেওয়া হয়।

প্রতিদিনের খাদ্যতালিকার চয়ন

CKD-এর রোগীদের প্রাত্যহিক খাবারের তালিকা ডায়েটিশিয়ান দ্বারা নেফ্রোলজিস্টের পরামর্শ অনুসারে প্রস্তুত করা হয়। তথাপি, খাদ্য তালিকার সাধারণ নীতিগুলি হল-

১. **জল এবং তরল খাবার গ্রহণ :** তরল এবং জল পান ডাক্তারবাবুর পরামর্শ মতই করা দরকার। প্রতিদিনের ওজনের তালিকা বানানো দরকার। শরীরের হঠাৎ ওজন বৃদ্ধি শরীরে অধিক তরলের উপস্থিতির প্রমাণ দেয়।

২. **শর্করা :** যদি রোগী মধুমেহ শিকার না থাকেন তাহলে শরীরে প্রয়োজনীয় ক্যালোরীর জোগানের জন্য রোগী প্রয়োজনমত চিনি বা শর্করা গ্রহণ করতে পারেন।

৩. **প্রোটিন :** ডাল, দুধ, ডিম, মাছ-মাংস হল প্রোটিনের প্রধান উৎস। সে সমস্ত CKD-এর রোগী যারা ডায়ালিসিস করান না তাদের প্রোটিন গ্রহণ নিয়ন্ত্রণ করতে পরামর্শ দেওয়া হয়। তাদের প্রতিদিন 0.8 গ্রাম প্রোটিন রোগীর প্রতি কেজি বয়সের হিসাবে গ্রহণ করতে বলা হয়। যখন রোগীর ডায়ালিসিস্ শুরু হয় তখন, অধিক প্রোটিনযুক্ত খাবারের পরামর্শ দেওয়া হয়, বিশেষ করে পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিসের রোগীদের ক্ষেত্রে। আমিষ খাবার না গ্রহণ করাই ভাল কারণ, আমিষ খাবারে প্রোটিনের সঙ্গে অধিক মাত্রায় ফসফরাস ও পটাশিয়াম থাকে।

৪. **ফ্যাট :** ফ্যাটের পরিমান খাবারে কম করা দরকার, কিন্তু পুরোপুরি বন্ধ করা উচিত নয়। সাধারণত সোয়াবিন তেল বা বাদামতেল শরীরের জন্য প্রয়োজনীয়, কিন্তু ইহার পরিমান কম করা দরকার।

৫. **লবণ :** কম লবণযুক্ত খাবারই ভাল। কাঁচা লবণ বা খাবার সোডা খাবেন না। কৃত্রিম লবণ ব্যবহার করবেন না কারণ তার মধ্যে অধিক পটাশিয়াম থাকে।

৬. **দানাশস্য :** ভাত বা চিঁড়ে এবং মুড়ি খাওয়া যেতে পারে। স্বাদ বদলানোর জন্য সাবুদানার, আটার তৈরি খাবার কম পরিমাণে খাওয়া যেতে পারে।

৭. **ডাল :** বিভিন্ন ধরনের ডাল কম পরিমাণে খাওয়া যেতে পারে। যেহেতু ডাল তরল সেজন্য এই পরিমাণটি সারাদিনের সর্বাধিক তরল গ্রহণের মাত্রার

হিসাবের মধ্যে রাখা দরকার। মোটা ডাল খেলে তাতে তরলের পরিমাণ কমে যায়।

ডালের পটাশিয়াম কম করার জন্য ডাল ফুটিয়ে জল ফেলে দিন। ভাত, ডাল আলাদা করে রান্না করার পরিবর্তে খিঁচুড়ি খাওয়া যেতে পারে।

৮. **ফল :** কম পটাশিয়ামযুক্ত ফল যেমন আপেল, পেঁপে প্রতিদিনে একবারই খাওয়া যেতে পারে। ডায়ালিসিসের দিনে, ডায়ালিসিসের আগে রোগী অন্য যেকোন একটি ফল খেতে পারেন। ফলের রস বা ডাবের জল খাবেন না।

৯. **শাকসব্জী :** কম পটাশিয়ামযুক্ত শাকসব্জী সাধারণভাবে খাওয়া যেতে পারে। বেশি পটাশিয়ামযুক্ত শাকসব্জীর পটাশিয়াম শাকসব্জীর থেকে কম করে তবেই খাওয়া দরকার। স্বাদের জন্য লেবুর রস মেশানো যেতে পারে।

১০.**দুধ বা দুগ্ধজাত সামগ্রী :** ৩০০ থেকে ৩৫০ মিলি দুধ বা দুগ্ধজাত সামগ্রী, যেমন দই, ক্ষীর, আইসক্রীম খাওয়া যেতে পারে। অধিক তরল গ্রহণ নিয়ন্ত্রণের জন্য এইসব খাবারের পরিমাণ কম রাখাই ভাল।

১১.**কোল্ড ড্রিংকস্ :** পেপসি, কোকা-কোলা, ফ্রুটি ইত্যাদি খাওয়া উচিত নয়।

১২.**শুকনো ফল :** কাজুবাদাম, বাদাম, নারকেল খাওয়া উচিত নয়।